২।২।৭৯ (5573)

২০।৩।৭৯ (5573)

16.7.79 (8638)

27/7/79 (2248)

10/8/79/808X)

ত্রিপুরার মন্দির

কার্তিক লাহিড়ী

দর্শক গ্রন্থমালা
৯/৩ টেমার লেন। কলিকাতা-নয়

দর্শক গ্রন্থমালা—১

প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩/১৩৭৯

প্রকাশক : শ্রীদেবকুমার বসু

বিশ্বজ্ঞান। ৯/৩ টেমার লেন। কলিকাতা-৯

TRIPURAR MANDIR

By : Kartick Lahiri

মুদ্রক : শ্রীসঞ্জয় দাশগুপ্ত

গ্রন্থ পরিক্রমা প্রেস।

৩০/১বি কলেজ রো। কলিকাতা-৯

মূল্য : চার টাকা

পরম পূজনীয়

ভারতবিদ্যা বিশারদ ডক্টর সুকুমার সেন

ত্রিপুরার মন্দির কোনও বিশেষজ্ঞ রচনা নয়, এবং তা বিশেষজ্ঞ পাঠকের জন্য লেখা নয়। সাধারণ পাঠকের কাছে ত্রিপুরার মন্দিরের বৈশিষ্ট্যের কথা পৌঁছে দেয়াই আমার উদ্দেশ্য, সেজন্য ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখার মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য ত্রিপুরার ইতিহাসে নানা সময়ের নানা ঘটনার মধ্যে বিস্তর ফাঁক রয়েছে, তা ভরাট করার জন্য যে পরিমাণ গবেষণা হওয়া উচিত, দুঃখের বিষয় তা এখনও হয়নি। বিশেষ করে ত্রিপুরায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা খুব কম হয়েছে, এবং রাজমালা গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে প্রায় নীরবতা আমাদের যথেষ্ট বিমূঢ় করে। উপরন্তু পিলাক অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে পুরাতত্ত্বের যেসব চিহ্ন এখনও বর্তমান, তা যথোপযুক্ত খননে গবেষণার জন্য প্রচুর উপকরণ জোগাবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। তাছাড়া আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রস্তুত হলে নানা দিকের আবরণ উন্মোচন হবে বলে অভিজ্ঞ গবেষকগণ মনে করেন। 'ত্রিপুরার মন্দির' এই দিকগুলি সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগালে খানিকটা শ্লাঘা অনুভব করবো নিশ্চিতভাবে।

শ্রীকৃষ্ণপদ দত্তর উৎসাহ ও প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া রচনাটি শেষ হতো কিনা সন্দেহ, রচনাটির যদি কোনও গুণ থাকে, তবে তা তাঁর প্রাপ্য।

সাহিত্য পত্র এর উৎসাহীরা বিশেষত প্রিয়ভাজন অরুণ সেন এবং বন্ধুবর দেবকুমার বসুর অতিশয় আগ্রহে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান অজয় রায় ও অধ্যাপক শ্রীমান রমেন্দ্র বর্মণ নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ দেয়া বাহুল্য মাত্র।

ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়ম ও শ্রীরবীন সেনগুপ্তর সৌজন্যে আলোকচিত্র পেয়েছি, এবং ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগ ব্লক দিয়ে সাহায্য করেছেন, এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশিষ্টে রচিত মন্দির তালিকায় অমরপুরের ফটিক সাগরের পশ্চিম ও উত্তর তীরে অবস্থিত (বর্তমানে বিলুপ্ত) দুটি মন্দিরের কথা বাদ পড়ে গেছে অসাবধানে। অমরপুরের আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির মঙ্গলচণ্ডী বাড়ি অমর সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। মন্দিরের তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ তালিকা রচনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পরবর্তী কোনও লেখক এ-বিষয়ে প্রচুর আলোকপাত করতে পারবেন বলে আমার ধারণা, সেই আশা নিয়ে আপাতত ভূমিকা রচনার ছেদ টানা যায়।

কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৭৯ — কার্ত্তিক লাহিড়ী

আগরতলা, ত্রিপুরা

হরি মন্দির। উদয়পুর ফটো: রবীন সেনগুপ্ত

চতুর্দশ দেবতার মন্দির। উদয়পুর

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির

জগন্নাথ বাড়ি। আগরতলা

ত্রিপুরার মন্দির

কার্তিক লাহিড়ী

কোনও অঞ্চলেব মন্দিব বা স্থাপত্য বিষযক আলোচনায সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিব পবিচয সাধাবণভাবে জানা দরকাব, কারণ স্থানীয আবহাওয়া, উপকবণেব প্রাপ্যতা ও স্থানীয অর্থনীতিব উপব অনেকখানি নির্ভব কবে সেই অঞ্চলে নির্মিত আবাসাদির স্থাপত্যশৈলী। অবশ্য এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাব সহজ সুবন্দোবস্তর কথাও উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার মন্দিব সংক্রান্ত আলোচনায সেজন্য ত্রিপুবাব ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিব পবিচয প্রসঙ্গ অনুযাযী জানা আবশ্যিক। দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১১৪ ও ৭০ মাইল ত্রিপুরা বাজ্য অক্ষাংশ ২২° ৫৬′ ও ২৪° ৩২′ উত্তব এবং দ্রাঘিমাংশ ৯১ ১০′ ও ৯২° ২১′ পূর্বে অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে ধাবিত জামপুই, লংতরাই, আঠারমুড়া, বড়মুড়া, দেবতামুড়া প্রভৃতি দীর্ঘ অনুচ্চ পাহাড়গুলোর জন্য সেখানকার প্রাকৃতিক মানচিত্র সমতল নয, অথচ পাহাড়গুলো পাথবেব নয, নানা রকমের মাটি দিয়ে গঠিত। ফলে পার্বত্য অঞ্চলেব যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, অধুনা অনেকখানি দূর হলেও, পুবোমাত্রায বর্তমান। অন্যপক্ষে এ বাজ্যেব সান্নহিত অঞ্চলগুলি একমাত্র পূর্বদিক ব্যতীত বাংলা দেশেব নিম্ন অঞ্চল। ত্রিপুরাব উত্তব দিকে সিলেট, পশ্চিম দিকে কুমিল্লা ও নোযাখালি জেলা, দক্ষিণ দিকে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পূর্ব দিকে লুসাই পাহাড় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থিত। পূর্বদিকে লুসাই ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য দিকে অবস্থিত অঞ্চলগুলি জলমগ্ন হলেও ভূমিব উর্বরতা ত্রিপুরার চেযে প্রাকৃতিক কাবণেই বেশি, সেজন্য এ অঞ্চলেব সাধাবণ মানুষ উক্ত অঞ্চলের সাধাবণ মানুষেব চেযে অনেক বেশি গবীব। তদুপরি ত্রিপুবার উল্লেখযোগ্য আটটি নদীব মধ্যে প্রায সবগুলি স্থানীয ভাবে নাব্য হলেও যাতাযাতেব পথ হিসাবে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয, একমাত্র গোমতী নদীকে প্রকৃতভাবে নাব্য নদী বলা যায। তাই গোমতীব তীরে ত্রিপুরার রাজধানী অমরপুব, রাঙ্গামাটি ও উদযপুর অবস্থিত ছিল, এবং ত্রিপুরার মন্দিবগুলি নদীর গতিপথ অনুসবণ কবেই যেন নির্মিত হযেছিল। গোমতীর তীবে অবস্থিত কুমিল্লা শহরেব কাছাকাছি ত্রিপুবা বাজাদের নির্মিত দেব-দেউলের কথা মনে রেখে সে কথা নিঃসংকোচে বলা চলে।

পাহাড়মষ হওয়ার ফলে এ অঞ্চল দুর্গম ও অগম্য ছিল, তাই ত্রিপুরার মহাবাজবা নিজেব স্বাধীনতা বজায রাখতে পেরেছিলেন স্বচ্ছন্দে। একমাত্র গোমতী নদী দিযে সন্নিহিত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ ছিল, সেজন্য

বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ত্রিপুরার নানাবিধ সংযোগের পথ রুদ্ধ হয় নি, বিশেষ করে পশ্চিম দিক দিয়ে বঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির (হিন্দু ও বৌদ্ধ) স্রোত ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে এবং হিন্দুধর্মের প্রভাব স্থায়ী হয়েছে নানা ক্ষেত্রে নানা দিকে। অন্যদিকে পূর্ব-দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে আরাকান ও ব্রহ্মের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছে। উত্তর পূর্ব দিকে যোগ ছিল যে অঞ্চলের সঙ্গে, সেই অঞ্চলের ও ত্রিপুরার সভ্যতা-সংস্কৃতির সাদৃশ্য থাকায় এবং উভয় অঞ্চলের সভ্যতা প্রায় সমপর্যায়ের হওয়ায় উত্তর পূর্ব দিকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ লক্ষ করা যায় না। ত্রিপুরাকে আনুভূমিক রেখা দ্বারা সমান দুভাগে ভাগ করলে রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলকে বহির্বিশ্বের দ্বার বলা চলে নিঃসন্দেহে। তবু আধুনিক যুগের (ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে মোটামুটি আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলা চলে) পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য দুর্গম ছিল, তাই যোগাযোগের অভাবে দূর দেশ থেকে পাথর বয়ে এনে মন্দির তৈরির কোনও প্রশ্নই ওঠে না, এজন্য যে আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন তা ত্রিপুরার রাজাদের ছিল কিনা বলা দুঃসাধ্য, যেহেতু রাজমালার বিবরণ অনুসারে প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, ফলে ত্রিপুরার রাজাদের রাজস্ব সেই পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না, যা দিয়ে কোণারক সূর্য মন্দিরের মতো স্থাপত্য কীর্তি রচনা করা যায়। ১৯০৩ ৪ সালে রাজ্যের আয় ছিল ৮ ১৭ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ভূমি রাজস্ব বাবদ আদায় হলো ২ ৩২ লক্ষ টাকা, ১৮৯০ ৯১ সালে রাজ্য ও জমিদারীর আয় মিলিয়ে সর্বমোট ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশ আটানব্বই টাকা, অতএব নিঃসংকোচে বলা চলে এই আয় দিয়ে বিরাট কিছু কীর্তি রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের অসুবিধা দূর করার জন্য যে অর্থ সামর্থ্যের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অর্থ রাজস্ব থেকে ব্যয় করা সহজ ছিল না, ফলে ত্রিপুরায় পাথরের তৈরি মন্দির প্রায় চোখে পড়ে না, যে কটি মন্দির এখন অবশিষ্ট আছে এবং যেগুলো বিলুপ্ত, তার একটি বাদে সবগুলি ইঁটের তৈরি, তাই স্থানীয় উপকরণের উপর নির্ভর করে যে সব মন্দির তৈরি হয়েছে, সেগুলো কোনক্রমেই দাক্ষিণাত্য বা পুরীর মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। জমির ভারবহন ক্ষমতা যথেষ্ট না হওয়ায় এবং ইঁট ও সীমিত মাল মসলা দিয়ে বিশাল গৃহ নির্মাণ সম্ভব নয় বলে ত্রিপুরার দেবালয়গুলি উচ্চতায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হ্রস্বায়তন বিশিষ্ট।

অথচ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের হ্রস্বায়তন দেবালয়গুলি হচ্ছে একটি নতুন ধরনের মন্দির স্থাপত্য, যার নজির ভাবতে মেলা ভার। (অভ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত টেম্পলস্ অব ত্রিপুরা। ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। সেজন্য নতুন ধরনের মন্দির-স্থাপত্য রীতির আলোচনার আগে ত্রিপুরার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় বিবরণ দেখা দরকার, কারণ বিশেষ বিগ্রহ ও তার মন্দির তৈরির

পেছনে কি অভিপ্রায বা প্রেবণা কাজ কবে ছিল, তা একমাত্র ইতিহাস আলোচনায উদ্ঘাটিত হওযা সম্ভব।

২

'বাজমালা'-ব প্রদত্ত বিববণেব উপব নির্ভব কবে ত্রিপুবা রাজ্যেব ইতিহাস উদ্ধাব কবাব প্রাথমিক সুবিধা থাকলেও, উক্ত বিববণেব (কথিত আছে 'বাজমালা' গ্রন্থেব সূচনা হয পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্মমাণিক্যেব শাসনকালে) প্রথম অংশ অনৈতিহাসিক ও কিংবদন্তিমূলক। বাজাবা যে চন্দ্র বংশ থেকে উদ্ভূত হযেছেন, বাজমালায দীর্ঘ বংশলতিকা প্রকাশ কবেও তা প্রমাণ কবা সম্ভব নয, সে কথা নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত 'বিশ্বকোষ' (অষ্টমভাগ)-এ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হযেছে, 'মণিপুব বাজবংশেব ন্যায ত্রিপুবার বাজবংশও শান বা লৌহিত্য বংশোদ্ভূত অথবা যদিও চন্দ্রবংশীয বলিতে হয তাহা হইলেও তাহা প্রমাণের বিশেষ কোনো সুবিধা নাই, কাবণ ইতিপূর্বে দেখা গেল যে দ্রুহ্যু হইতে ত্রিপুবেব মধ্যে ৩২ জনেব নামেব অভাব এবং ত্রিপুব হইতে বালেচনেব মধ্যে ৪০ জনেব নামেব অভাব।" (পৃঃ ২০০)। বত্নফা থেকে এই বাজবংশেব পবিচয অনেকেব কাছে সাধাবণভাবে ইতিহাসসম্মত। ত্রিপুবাব বহু নৃপতি ফা উপাধি গ্রহণ কবতেন, "পূর্বে ত্রিপুবা বাজাব পূর্বপুরুষদেব বাজা উপাধি ছিল না। আমাদেব দেশেব খন বাউ নাগাবা যেমন সেইরূপ অমুক ফা তমুক ফা নামে তাহাবা পবিচিত ছিলেন।" (ত্রিপুর দেশেব কথা—ত্রিপুবচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৪০)। বত্ন ফা তুগ্রলেব সহাযতায ত্রিপুবাব সিংহাসনে আবোহণ কবেন। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তুগ্রল জাজনগব আক্রমণ কবেন এবং বাজাকে পবাজিত কবে বহু দ্রব্যসামগ্রী ও একশ হাতী লুণ্ঠন কবে প্রত্যাবর্তন কবেন (চার্লস স্টুয়ার্ট প্রণীত হিসট্রি অব বেঙ্গল, পৃঃ ৪৪ দ্রষ্টব্য)। ঘটনাটি কৈলাসচন্দ্র সিংহেব মতে বত্ন ফাব বাজসিংহাসন আবোহণের ঘটনা (বাজমালা, ২ ভাগ ৩ অধ্যায, পৃঃ ৩০)। অথচ জাজনগব যে ত্রিপুবা নয, একথা সুস্পষ্ট ভাবে অনেকে জানিযেছেন, তাব মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযেব নাম উল্লেখযোগ্য, "জিযাউদ্দীন বার্ণী বচিত তাবিখ ই-ফিবোজশাহীতে যে জাজনগবেব উল্লেখ আছে, তাহা যে ত্রিপুরা হইতে পাবে না, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইযাছে।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয ভাগ, পৃঃ ৭৫)। ডঃ কালিকাবঞ্জন কানুনগো-ও মনে করেন যে জাজনগর উড়িষ্যায, বোধহয উড়িষ্যাব উত্তবে অবস্থিত। (যদুনাথ সরকাব সম্পাদিত, দি হিসট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয ভাগ, পৃঃ ৩৭ দ্রষ্টব্য)। 'শ্রীরাজমালা'-র সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ মনে করেন, 'সুলতান সামসুদ্দিনই রত্ন ফা-এর (রত্নমাণিক্য) পক্ষ অবলম্বনপূর্বক ত্রিপুরা আক্রমণ করিযাছিলেন।" (শ্রীবাজমালা, প্রথম লহব, পৃঃ ১৯২)। এই বিতর্কের মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট হয যে, রত্ন ফা

গৌড়রাজের সহায়তায় রাজ্যলাভ করেন, ফা-এর বদলে রাজাদের মাণিক্য উপাধি লাভ তখন থেকে প্রচলিত হয়:

"রত্ন ফা নাম তার পিতায়ে রাখিছিল।
রত্নমাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বরে দিল ॥
তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে।
বিদায় হইয়া রাজা চলিলেক দেশে ॥
(শ্রীরাজমালা, প্রথমলহর, রত্নমাণিক্য খণ্ড, পৃঃ ৬৭)।

সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে রত্নমাণিক্যর সিংহাসন আরোহণ ত্রিপুরার পক্ষে একটি নতুন যুগের সূচনা। সেই সময় ত্রিপুরাকে বহির্বিশ্বের, বিশেষ করে গৌড়ের, আদলে গড়ার চেষ্টায় মহারাজ গৌড় রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনেন, অন্যদিকে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাসনযন্ত্রকে ঢেলে সাজান মুসলমান শাসনব্যবস্থার অনুসরণে। কথিত আছে, মহারাজ রত্ন ফা মৃগয়া করতে নিবিড় বনে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেই সময় 'ভেকমণি' পেয়েছিলেন, এই উজ্জ্বল মণি ও একশ হাতী তিনি তুগ্রলকে উপহার দিলে গৌড়াধিপতি তাঁকে মাণিক্য উপাধিতে ভূষিত করেন। 'ত্রিপুরা দেশের কথা-'র লেখকদ্বয় রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস রত্ন ফার ভেকমণি পাওয়ার ঘটনা বিবৃত করেছেন, তবে সেই বিবরণে অলৌকিকত্বের আতিশয্য বর্তমান। শ্রীধনঞ্জয় দেববর্মণ লিখেছেন, 'প্রবাদ আছে যে, পূর্বে কোন সময়ে এইস্থানে (মাণিক-ভাণ্ডার—আমার সংযোজন) প্রভূত পুণ্যনাম প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজাধিরাজ আদিরত্নদেব বর্ম-মাণিক্য বাহাদুরের স্থাপিত প্রধান রাজধানী ছিল। অদ্যাপিও সেই রাজধানী ও রাজ প্রাসাদের পরিচায়ক ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ ও ইষ্টক বিনির্মিত ভগ্নাবশিষ্ট সোপান সহ দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ এক সময়ে যে এই স্থানে রাজধানী ছিল তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই রাজপ্রাসাদেরই অনতিদূরে জঙ্গলাবৃত এক বৃহৎ পুষ্করিণী 'মাণিক ভাণ্ডার নামে আখ্যায়িত'। প্রবাদ যে, এই পুষ্করিণী হইতে দেব প্রসাদে প্রভূত পুণ্যনাম মহারাজাধিরাজ আদিরত্ন মাণিক্য বাহাদুর মাণিক্যাখ্য মহারত্ন লাভ করিয়াই মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তদবধি আবহমান কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণাবস্থায় তাহারই সাক্ষ্য স্বরূপে মাণিক্যাখ্য উপাধি চলিয়া আসিতেছে।" (স্বাধীন ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের মধ্যবর্তী সীমানাদির তদন্ত সম্বন্ধীয় রিপোর্ট, পৃঃ ১৯-২০)। উপরিউক্ত কাহিনীগুলি যে কিংবদন্তিমূলক তা পাঠকের বোধগম্য হয় সহজে।

পণ্ডিতদের বিবেচনায় ত্রিপুরা রাজবংশ মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বতী-বর্মী শাখার শান পরিবার ভুক্ত। চন্দ্রবংশ থেকে উদ্ভবের বিষয়টি পরবর্তীকালের সংযোজন, যখন ত্রিপুরার রাজারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে বিশেষ তৎপর ছিলেন তখনকার ঘটনা। নিজেদের ক্ষত্রিয় প্রমাণের জন্য 'বর্মণ' উপাধি যোগ

করা তখনকার রেওয়াজ ছিল বলে মনে হয়। "Varman Varmma, armour or defence) was a common kshatriya title, and, as such, was appropriated by aboriginial converts to Hinduism of high rank." (স্যার এডওয়ার্ড গেইট, এ হিস্ট্রি অব আসাম, ১৯২৬, পৃঃ ২৬)। অবশ্য বাংলা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজাদের চন্দ্রবংশজ দাবি করা প্রথায় পরিণত হয়েছিল, যেমন রাজস্থানে সূর্য বংশের নবপর্ণের বাহুল্য দেখা যায়। সেন রাজারা চন্দ্রবংশোদ্ভূতও বটেই, এমনকি শ্রীহট্টের অধিপতি গোবিন্দদেব ও ঈশানদেবের তাম্রফলকে তাঁদের চন্দ্রবংশজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মণিপুর রাজবংশও বভ্রুবাহনের সূত্রে চন্দ্রবংশজ বলে বিখ্যাত হয়েছেন।

পাল যুগের অবনতির সময় পূর্ববঙ্গে বর্মণ উপাধিধারী এক রাজবংশ রাজত্ব করতেন, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে এ অঞ্চলের রাজধানী ছিল পট্টিকেরা, পূর্বতন ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী পাহাড়ে যার ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। (রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, হিস্ট্রি এণ্ড কালচার অফ ইণ্ডিয়ান পিপল-এর পঞ্চম খণ্ড, দ্য স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার, পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস 'মহারাজোবাং' গ্রন্থে ত্রিপুরাকে পট্টিকেরা রাজ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনুমান করা অন্যায় নয় যে, বর্মণ রাজাদের আধিপত্য সমগ্র ত্রিপুরায় বিস্তৃত ছিল। ঊনকোটি পাহাড়ে খোদিত মূর্তির কাল যদি দশম একাদশ শতাব্দী হয় তবে স্বচ্ছন্দে ধারণা করা যায় যে, বর্মণ রাজাদের কোনও একজনের রাজত্বকালে তা খোদিত হয়। পট্টিকেরা রাজ্যের উল্লেখ ব্রহ্মের ঐতিহাসিক উপাখ্যানে যথেষ্ট পাওয়া যায়, ব্রহ্মরাজ কনজিথের (১০৮৪ ১১১২) কন্যার সঙ্গে পট্টিকেরার রাজপুত্রের ব্যর্থ প্রণয় কাহিনী তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুত্র প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেন, কিন্তু সেই রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র অলংসিথু মাতামহের মৃত্যুর পর ব্রহ্মের রাজা হন এবং তিনি পট্টিকেরার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। অলংসিথুর মৃত্যুর পর তার পুত্র নরথু সিংহাসনে আরোহণ করে পট্টিকেরার রাজকন্যাকে হত্যা করেন, এই রাজকন্যা নরথুর বিমাতা ছিলেন। কন্যার হত্যা সংবাদ শুনে পট্টিকেরা রাজা প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট হন। আটজন বিশ্বস্ত সৈনিক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে সেই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগানে গমন করেন, এবং ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ করার ছল করে রাজার কাছে গিয়ে রাজাকে বধ করে নিজেরাও আত্মহত্যা করেন। অবশ্য আরাকান ইতিহাসে এ ঘটনার বিবরণ অন্যরকম। সেই বিবরণে জানা যায় যে, মারওয়া রাজ্যের জনৈক পট্টিকেরা রাজা তাঁর দুই কন্যাকে উপহার স্বরূপ আরাকান ও তম্পাদ্বীপের রাজার কাছে প্রেরণ করেন। আরাকানের সেনাপতি দ্বিতীয় রাজকন্যাকে ব্রহ্মরাজ নরথু-র কাছে পাঠান, এবং অনুরোধ করেন, নরথু যেন সেই কন্যাকে তম্পাদ্বীপে পাঠান। রাজকন্যা নরথু-কে

এই অপকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করলে রাজা তলোয়ার বের করে কন্যাকে বধ করেন। (রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, প্রথম ভাগ পৃঃ ২৫৭ ২৫৮)। এছাড়া যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে তা অবিশ্বাস্য হলেও, একটি কথা স্পষ্ট হয় যে, ব্রহ্মদেশের সঙ্গে পট্টিকেরার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। রণবঙ্কমল্ল শ্রী হরিকাল দেব ১২০৪ অব্দে পট্টিকেরার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি প্রায় ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। এরপর এ অঞ্চলে দেববংশ যথেষ্ট প্রভুত্ব বিস্তার করেন। দামোদর দেবের তাম্রশাসনে তাঁর রাজত্ব যে ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্মণবংশের মতো দেব বংশও নিজেদের চন্দ্রবংশোদ্ভূত বলে মনে করতেন। (ঐ, পৃঃ ২৫৩ দ্রষ্টব্য)। ত্রিপুরার রাজারা প্রচলিত বেওনাজ ছাড়াও বর্মণ ও দেববংশের চন্দ্রবংশোদ্ভূতের দাবি থেকে প্রেরণা পান বলে মনে হয়। বর্মণ বংশের বংশলতিকার অনুকরণে তারা একটি বংশলতিকা দাড় করাতে চেষ্টা করেন। বর্মণ বংশলতিকায় যযাতির পর যদু এবং ত্রিপুরার রাজবংশ লতিকায় যযাতির পর দ্রুহ্যু স্থান নির্দিষ্ট, এবং দ্রুহ্যু থেকে ত্রিপুরা রাজবংশ-লতিকা ভিন্নপথ অনুসরণ করেছে। ত্রিপুরারা বর্তমানে যে 'দেববর্মণ' উপাধি ব্যবহার করেন, মনে হয় এই উপাধি দেব বংশের 'দেব' এবং বর্মণ বংশের 'বর্মণ' উপাধি যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে। ত্রিপুরাদের 'দেববর্মণ' উপাধি ব্যবহারে অবশ্য তাদের ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ার বাসনা লক্ষ করা যায়।

দেব রাজশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লে পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতীয় প্রধানরা ক্রমে প্রবল হয়ে উঠে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হওয়ায় স্থানীয় প্রধানদের মধ্যে আপন প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিবাদের মধ্য দিয়ে অবশেষে গৌড়রাজের সহায়তায় রত্নফা ত্রিপুরাকে নিজের অধীনে আনতে সক্ষম হন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে, এবং রাজমালা পড়লেও তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

> "অনুমতি পাইলেক নৃপতি তনয়।
> গৌড়াধিপে সৈন্য তাকে দিল অতিশয়॥
> রত্নফা চলিল নিজ রাজ্য লইবারে।
> কতদিনে আসিলেক জামির খাঁর গড়ে॥
> গড় জিনি রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া লৈল।
> ডাঙ্গর ফার সৈন্যসব পর্বতেতে গেল॥
> আর রাজপুত্র সভে ভঙ্গ দিল তায়।
> গৌড় সৈন্য তার পাছে খেদাইয়া যায়॥

সর্বভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল রাজ্যস্থান।
পুনর্ব্বার গেল গৌড়েশ্বর বিদ্যমান।।"

(শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালা'—প্রথম লহর-রত্ন মাণিক্য খণ্ড, পৃঃ ৬৬-৬৭)। *

ত্রিপুরার রাজবংশ যে স্থানীয় ত্রিপুরা আদিবাসী থেকে উদ্ভূত এবং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যে স্থানীয় আদিবাসী ত্রিপুরা সমাজের প্রতাপশালী নেতা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 'বাছাল' সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রচলিত আছে, এরাই পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি ছিল, এবং এই বাছালদের পরাজিত করে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ত্রিপুরা রাজারা রাজ্যলাভ করেছিলেন। তবে হালামরা যে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন এবং তাদের থেকেই রাজ্য মাণিক্যদের হাতে এসেছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য। (ঐ, পৃঃ ২১৬ দ্রষ্টব্য)। তিপ্রারা তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে 'তিপ্রা রাজ্য' বলে। এই 'তিপ্রা' থেকে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। ('তুইপ্রা' থেকে তিপ্রা, তারপর তিপ্রা থেকে তৃপুরা, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা-র উদ্ভব সম্ভব)। এ অঞ্চলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আর্যীকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল, যার গতিবেগ রত্নমাণিক্য থেকে অতি দ্রুত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

অন্যান্য আদিবাসীদের চেয়ে নানা বিষয়ে তিপ্রারা অগ্রগণ্য। রাজ্যের সন্নিহিত অঞ্চলের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে সবচেয়ে বেশি, এবং রাজবংশ হওয়ায় এরা নানা বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধাও পেয়েছে। অন্যদিকে রাজধানী ও রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করার জন্য বহির্বঙ্গের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়েছে সহজে, ফলে বিভিন্ন দিকে তারা এগিয়ে গেছে স্বাভাবিক কারণে। এই ত্রিপুরারা মঙ্গোল জাতীয় এবং আরাকানের মুরাঙদের সঙ্গে এদের আকৃতিগত যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। (দি ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার, ১৩ খণ্ড, ১৯০৮সং, পৃঃ ১১৯-১২০ দ্রষ্টব্য)। রাজার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর সমগ্র তিপ্রাজাতিও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও এরা নিজেদের লৌকিক ধর্ম জলাঞ্জলি দিতে পারে নি। এমন কি রাজারাও শাক্ত, শৈব ও পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলেও আদিবাসীধর্ম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারেন নি, তার প্রমাণ আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত 'খাচপূজা' নামে চোদ্দ

---

* রত্নফার সিংহাসন আরোহণের ঘটনা ইতিহাসসম্মত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত রাজমালায় ত্রিপুরারাজাদের বিবরণ (অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বপর্যন্ত), বা রাজাদের নামাবলী এবং কার্যকলাপ অন্যান্য সাক্ষ্যে প্রমাণিত না হলে ইতিহাস পদবাচ্যরূপে স্বীকার করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে একটা আনুমানিক ইতিহাস দাঁড় করানো চেষ্টারও মূল্য আছে নিশ্চয় সেক্ষেত্রে।

দেবতার এক বিশেষ পূজা এবং তার চোদ্দ দিন পরে শনি বা মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত কের পূজা। ত্রিপুরা রাজাদের কুলদেবতা হলেন চতুর্দশ দেবতা, এবং চতুর্দশ দেবতার মধ্যে তুইমা—নদীর দেবতা, লাম্প্রা, আকাশ ও সমুদ্রের দেবতা এবং বুড়োশা—বনের দেবতা, বাকি দেবতাগুলি হিন্দুদেবতা। (ঐ, পৃঃ ১২০ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ চতুর্দশ দেবতা হলেন মিশ্র দেবতা। কিন্তু এ মত গ্রহণ করা যায় না, কারণ চতুর্দশ দেবতার চোদ্দটির হিন্দুনাম যেমন আছে, তেমনি চোদ্দ দেবতার কোনো (tribal) নামও পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় যে, চতুর্দশ দেবতা পরবর্তী সময়ে আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণের কৃপায় হিন্দু আখ্যায় পরিচিত হয়েছেন, এ সম্পর্কে কৈলাশচন্দ্র সিংহ 'রাজমালা'য় ইঙ্গিত করেছেন।

এই চোদ্দটি দেবতার মধ্যে লাম্প্রা ও সংগ্রামার পূজা প্রতিদিন হয়ে থাকে, অন্যান্য দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। চতুর্দশ দেবতা যে আদিতে আদিবাসী দেবতা ছিলেন, তার অন্য একটি প্রমাণ এর পূজক গোষ্ঠী। চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজকের উপাধি 'চন্তাই', এটি ত্রিপুরী শব্দ বা তার রূপান্তর নিঃসন্দেহে।' দেবালয়ের কাজকর্মে যারা নিযুক্ত তাদের উপাধি দেওড়াই, গালিম প্রভৃতি। এই উপাধিগুলি ইন্দো ইরানীয় পরিবারভুক্ত শব্দ নয় তা বলাই বাহুল্য। এসব কাজে এখনও পর্যন্ত আদিবাসীরাই নিযুক্ত আছেন, তবে এসম্পর্কে বিশদ গবেষণা হলে অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে, যে সব তথ্যের ফলে ত্রিপুরার ইতিহাস নতুনভাবে হয়ত লিখতে হতে পারে।

ত্রিপুরা পার্বত্যময় ও অরণ্য অধ্যুষিত, এবং এ অরণ্যে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মায়। গৃহ নির্মাণ, ব্যবসাবাণিজ্য, এমনকি খাদ্য হিসাবে (কচি বাঁশের কন্দ) বাঁশ ত্রিপুরা ও অন্যান্য আদিবাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, উৎসব পার্বণে [illegible] বাঁশের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপরন্তু এদের দেবতাদের কোনও মূর্তি নেই, সমস্ত পূজা বাঁশের [illegible] দেওয়া হয়। আর্যীকরণের পূর্বে [illegible] লক্ষণীয় নয়, তখন বাঁশই ঈশ্বরের স্থান বা দেবতার মূর্তির স্থান গ্রহণ করেছে বলা চলে। নকচুমতাই (গৃহের দেবী), মাইমতা (নবান্নের সময় একটি পূজা), গরিয়া প্রভৃতি পূজায় বাঁশ দিয়ে চতুষ্কোণ একটি জাফরি তৈরি করে অথবা বাঁশ দিয়ে অনেক দেবতা বানিয়ে বা পাতা সমেত একটা আস্ত মুলি বাঁশ পুঁতে নানা উপাচারে পূজো করা হয়। কের পূজার মতো কুকিদেরও অনুরূপ পূজা আছে। কের পূজায় একটি বাঁশ পুঁতে মন্ত্রের সাহায্যে সেই বাঁশকে ভূমি স্পর্শ করানো হয়, এবং বাঁশের আগা মাটি স্পর্শ করলেই পূজো সিদ্ধ হয়েছে বলে ধরা হয়। এছাড়া কৃষি সংক্রান্ত দেবতার যেমন মাইলুমা (ধানের দেবতা), খুলুমা (তুলোর দেবতা) প্রভৃতি পূজোতেও বাঁশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এইসব দেবতারা যে পরবর্তী সময়ে

হিন্দুদেবতায় পরিণত হয়েছেন সে বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও হিন্দুয়ানের ব্যাপারে রাজারা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না। অদ্যাবধি চতুর্দশ দেবতা রাজা প্রজা নির্বিশেষে সকলের কাছে জাগ্রত দেবতা রূপে গণ্য। অথচ পুরান আগরতলায় চতুর্দশ দেবতার মন্দিরটি যে পাহাড়িদের চতুর্দশ দেবতা সে কথা 'বিশ্বকোষ'-এ বলা হয়েছে, "পুরাতন রাজবাটীর নিকট একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে পাহাড়ীদিগের চতুর্দশ দেবতার প্রতিমা (পিতল নির্মিত মুণ্ড মাত্র) আছে।" (অষ্টম ভাগ, পৃঃ ১৯৮)।

মন্দির বা রাজ অট্টালিকা নির্মিত হলেও শুধুমাত্র রাজন্যবর্গের বৃত্তান্ত বা তাদের ধর্মমতের আলোচনার সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্ট হয় না। জনসাধারণের সামাজিক সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ধ্যান ধারণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক, বিশেষ, কারণ সে যুগ সভ্যতা সংস্কৃতিতে অনগ্রসর হলে এবং সে অঞ্চলের সভ্যতা সংস্কৃতি অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক হলে তো কথাই নেই। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় তখন ত্রিপুরী বা মুরাঙ্ ভাষাভাষী লোক মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৪ ভাগ ছিল। যদিও জানা যায় ১৮৯১ সাল থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে চল্লিশ হাজার লোক প্রতিবেশী জেলা থেকে এ রাজ্যে এসেছে। ১৮৭২ সালের রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫,২৬২, যদিও এই লোকগণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। (ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ১১২)। এর পূর্বে লোকসংখ্যা আরও কম ছিল তা অনায়াসে বলা যায়, এবং এদের মধ্যে ত্রিপুরীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, ফলে এ অঞ্চলের আচার অনুষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। ত্রিপুরার মহারাজরা মহাদেব, হরি, লক্ষ্মীনারায়ণ, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, এবং তা না করে উপায় ছিলনা, কারণ আদিবাসীদের ধর্ম, সংস্কৃতি চেতনা হিন্দুদের চেয়ে অনেক নিম্ন পর্যায়ে ছিল। তা ছাড়া হিন্দুপ্রজার জীবন জনগণকে আকৃষ্ট করে [illegible] হয়েছে, তদপেক্ষা উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাজা কিংবা প্রজা কেউ-ই তাদের প্রাচীন সংস্কার ছাড়তে পারেন নি। এখনও উদয়পুরে মহাদেবের মন্দিরে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এই প্রথা নিশ্চয়ই অনার্য প্রভাবজাত। ত্রিপুরা-সুন্দরীর মন্দিরে ডিম পূজো দেয়াও অনুরূপ অনার্য প্রথা। মহাদেবের সামনে পশুবলি দেওয়ার প্রথা মুণ্ডা জাতির মধ্যে দেখা যায়। "জুয়াঙ্গ জাতি যেমন লক্ষ্মীদেবীর নামে

---

* চতুর্দশ দেবতার কৌম নাম : বুড়াশা, লাম্প্রা, আখরা, বিখরা, সংগ্রামা, থুমনাইরগ, বনিরগ, তুইবুক কালাঙ্কারাজা, কুলার ভংগ, রাজা, সন্থলি রাজা, ঝুবুকন্ড-রাজা, নাগরাজা কাল্শ্রী ও জামপিরা।

চতুর্দশ দেবতার হিন্দু নাম : হর, উমা, হরি, মা (লক্ষ্মী), বাণী, কুমার, গণেশ, বিধি (ব্রহ্মা), ক্ষ্মা (পৃথিবী), সমুদ্র, গঙ্গা, শিখী (অগ্নি) কাম ও হিমাদ্রি।

মোরগ বলি দেয়, ইহারাও তেমনি মহাদেবের নিকট পশুবলি দিয়া থাকে, অথচ ব্রাহ্মণ শাসনের অধীন সেরূপ রীতি কোথাও প্রচলিত নাই।" (নির্মল কুমার বসু—হিন্দু সমাজের গড়ন, পৃঃ ৩৭—৩৮)।

হিন্দুধর্মের প্রভাব এ অঞ্চলে ব্যাপক ও গভীর ভাবে পড়েছিল, তার কথা কিছু আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন কালেই এ অঞ্চলে হিন্দুধর্মের বিস্তার ঘটেছিল, "Reference is made in one of three records to settlement of Brahmanas, versed in four Vedas, even in the eastern most regions of Bengal, full of dense forest, where tigers and other wild animals roamed at large". (R C Majumdar, ed, The History of Bengal, Vol I, p 396) এবং হিন্দুধর্মের প্রভাব পরবর্তী সময়ে না কমে বরং বেড়েই চলেছিল, এর অন্যতম কারণ অবশ্য পার্শ্ব তী অঞ্চল থেকে বহু লোকের ত্রিপুরায় আসা। এই লোক আসা রত্নমাণিক্যের সময় থেকে ক্রমাগত বেড়েই চলে—

"ভদ্রলোক প্রভৃতি যতেক নবসেনা।
স্বর্ণগ্রামে পাইল শ্রীকর্ণ কত জনা॥
সে সব সহিতে রাজা রাজ্যেতে আসিল।
রাঙ্গামাটি দুই হাজার ঘর বসাইল॥
রত্নপুরে বসাইল সহস্রেক ঘর।
যশপুরে বসাইল পঞ্চশত পর॥
হীরাপুরে পঞ্চশত ঘর বৈসাইল।
এই মতে রাঙ্গামাটি নবসেনা গেল॥

* * *

সর্ব্বজন মিলিলেক আর মিলে কুকী।
প্রজা লোক সুখে বসে নাহি কেহ দুঃখী॥"

(শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর, রত্নমাণিক্য খণ্ড, পৃঃ ৬৪ – ৬৯)

তাছাড়া, আদিবাসী সমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির চেয়ে নিম্নপর্যায়ের, ফলে সেই সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকবে তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে রাজার ধর্ম গ্রহণের দিকে প্রজাদের আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, সেদিক থেকেও ত্রিপুরায় হিন্দুধর্ম প্রসারে কোনও বিঘ্ন ঘটে নি। তবু আদিবাসী সমাজ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেও তাদের প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান বর্জন করেনি, এখনও তারা তাদের প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে থাকে। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে ত্রিপুরার জীবনকে প্রভাবিত করেছে—এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব, কিন্তু যে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব

প্রত্যক্ষ নয়, যা এখন ভারতবর্ষেই প্রায় বিলুপ্ত, সেই ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ত্রিপুরার মন্দির স্থাপত্যে আশ্চর্য ছাপ রেখে গেছে বলে সেই পরোক্ষ প্রভাব বিতরণকারী ধর্মের প্রসার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন, নচেৎ ত্রিপুরার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা খণ্ডিত হতে বাধ্য।

ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামে সম্রাট বৈন্যগুপ্তর (খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগ) ভূমিদান বিষয়ক যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে, তাতে মনে হয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে তখনই মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। হুয়েনসাং-এর বিবরণেও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে সমধিক ছিল তা বোঝা যায়। সমতট প্রদেশের রাজধানীতে প্রায় ৩০টি বৌদ্ধ বিহারে দুহাজার ভিক্ষু থাকার কথা বলা হয়েছে। পাল রাজাদের আমলে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা সর্বজনবিদিত।

পালরাজারা যখন দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে তাঁদের কর্তৃত্ব হারান, তখন ঐ অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের খবর পাওয়া যায়, তার মধ্যে হরিকেল-রাজ কান্তিদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন। দশম শতকের শেষার্ধে লড়হচন্দ্র নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এছাড়া 'চন্দ্র' উপাধিধারী রাজারা দশম শতাব্দীর শেষ অর্ধে পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজ্য গড়েছিলেন। এই বংশের ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র হরিকেল অধিপতি ছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্র দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের পূর্বে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ ('ভদ্র' বংশ) বৌদ্ধ 'খড়্গ' বংশ দ্বারা উৎখাত হয়েছিল। ময়নামতীর সাম্প্রতিক খনন কার্য থেকে জানা যায় যে খড়্গদের পর এক দেব বংশ সপ্তম শতকের শেষ ও অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন, দেব রাজারা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন : "The Devas seem to have come to power not much long after the Khadgas, as suggested by the style of writing on their inscirptions and coins, which bear a close resemblance with the later Gupta script. In the present stage of our knowledge, the reign of the Devas can reasonably be assigned to a period between the last part of the 7th and the middle of the 8th centuries A. C. Nothing definite is known at present either about their decline or their successors." (Dr. F. A. Khan, Mainamati, A preliminary report on the Recent Archaelogical Excavations in East Pakistan, Department of Archaeology, Government of Pakistan, p. 19). ময়নামতীর সাম্প্রতিক খনন কার্যে রোহিতগিরির 'চন্দ্র' রাজাদের সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানবার অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রথম

'চন্দ্র'দের বংশলতিকা সঠিক ভাবে জানা গিয়েছে : ১ পূর্ণ চন্দ্র ২ সুবর্ণ চন্দ্র ৩. ত্রৈলোক্য চন্দ্র ৪. শ্রীচন্দ্র ৫ কল্যাণ চন্দ্র ৬. লড়হ চন্দ্র ৭ গোবিন্দ চন্দ্র। (ঐ পৃঃ ২১)। খ্রীঃ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত আর এক চন্দ্র বংশ রাজত্ব করতেন বলে লামা তারনাথ জানিয়েছেন। এ ছাড়া পট্টিকেরার সঙ্গে ব্রহ্মরাজাদের যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেবের যে তাম্রশাসন ময়নামতী পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায় যে রাজমন্ত্রী শ্রীধড়ি পট্টিকেরা নগরের এক বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান করেন। এই সব রাজাদের প্রভাব থেকে পার্বত্য ত্রিপুরা মুক্ত ছিল, এ কথা ভাবা মুস্কিল। খড়্গ বংশ, আদি দেববংশ, আদি চন্দ্রবংশ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন এবং তারা সন্নিহিত অঞ্চলেই নয়, সুদূর কামরূপ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন, তাই মধ্যবর্তী অঞ্চল, অর্থাৎ পার্বত্য ত্রিপুরায় তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়া স্বাভাবিক।

আবার অন্য একদিক দিয়েও আরাকান হয়ে চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায়, বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ হয়েছিল। আরাকান রাজা আনন্দচন্দ্রের সময় (খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দী) উৎকীর্ণ এক সংস্কৃত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। আরাকানে কিছু প্রাচীনলিপি ও মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, তাতে 'চন্দ্র' উপাধধারী একাধিক রাজার নাম পাওয়া যায়। আরাকানের চন্দ্র বংশ ও সমতটের চন্দ্রবংশ একই কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে। (আর সি. মজুমদার, হিন্দু কলোনিস ইন্ দি ফার ইস্ট, পৃঃ ২০৩—২০৫ দ্রষ্টব্য) পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রহ্মদেশের রাজা আরাকান অধিকার করলে আরাকানরাজ সুলতানের সাহায্যে রাজ্য উদ্ধার করেন, সেই সময় থেকে আরাকানের বৌদ্ধ রাজগণ নামের সঙ্গে মুসলমানী উপাধি ব্যবহার করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরাকানরাজ ত্রিপুরা আক্রমণ করে উদয়পুর দখল করেন। (আরাকান ত্রিপুরার যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল,' দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৪২—২৪২ দ্রষ্টব্য।) আবার দশম শতাব্দীতে আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এমন কি পাগান যুগের কোনও কোন রাজা বাংলার এই অঞ্চল আক্রমণও করেছিলেন। (Dr Heinz Bechert এর Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura প্রবন্ধ, Educational Miscellany, Vol IV, nos, 3 & 4, p. 4 দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত দিয়েও এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল নানাভাবে নানা সময়। ত্রিপুরার বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা তেত্রিশ হাজার সাত শ ষোলো (১৯৬১ সনের লোক গণনা অনুসারে), এবং উত্তর অঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে বৌদ্ধদের সংখ্যা বেশি, যে অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে সংলগ্ন। রাজমালা অবশ্য ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নীরব, কিন্তু ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়ে একটি বৌদ্ধ আশ্রম নির্মিত হয়েছিল, এবং

আগরতলার রাজপরিবারের জনৈক ব্যক্তি ঐ আশ্রমের ভিক্ষু দ্বারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তিনি একটি নতুন বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন, এবং সেই বিহারে একটি বৃহৎ পরিনির্বাণ বুদ্ধের মূর্তি রাখা হয়েছিল। (ঐ প্রবন্ধ, পৃঃ ২০)। তিব্বতী তারানাথ লামাও ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কিছু সংবাদ দিয়েছেন। তারানাথ বহুকথা লিখেছেন, তার সার নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত "বিশ্বকোষ" (অষ্টমভাগ)-এ দেওয়া হয়েছে: রামপালের রাজত্বকালে বৌদ্ধতান্ত্রিক বিরূপ আবির্ভূত হন। এর প্রধান শিষ্যের নাম কাল বিরূপ। বিরূপের আর একটি নাম ধর্মপাল। কাল বিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম ত্রিপুরাধিপ ও 'ডোম বিরূপ হেরুক'। কাল বিরূপ একসময় ত্রিপুরায় এলে ত্রিপুরাধিপতি তাঁর সদুপদেশ শুনে মুগ্ধ হন, এবং তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতে শক্তি সঙ্গম না হলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। রাজা একদিন প্রত্যাদেশ পেলেন যে, পদ্মাবতী নামে এক ডোম কন্যাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করলে তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে। রাজা সন্তুষ্ট চিত্তে সেই ডোম কন্যাকে গ্রহণ করলেন, এবং সাধনার জন্য তিনি রাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ডোমরাজ বা ডোমাচার্য নামে বিখ্যাত হলেন। ডোম জাতির না হলেও রাজা ডোমকন্যা গ্রহণ করায় রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে রাজ্যে মহামারী উপস্থিত হয়, দৈবজ্ঞরা গণনা করে বুঝলেন যে রাজা না থাকার কারণেই এই অনাসৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। প্রজারা অতি যত্ন করে রাজাকে আবার রাজত্বের ভার গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। রাজা 'ধর্ম' নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচার করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে বহু প্রজা ঐ ধর্মমত গ্রহণ করে (পৃঃ ২১৫ দ্রষ্টব্য)। গল্পটি অবিশ্বাস্য হলেও ত্রিপুরায় যে প্রাচীন কালেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল, তার আভাস পাওয়া যায়। রাজকীয় পূজা আচার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে কিনা সে বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে, কিন্তু মন্দির স্থাপত্যে বিশেষ করে মন্দিরের মস্তক অংশে স্তূপের বা তারই বিবর্তিত রূপের অস্তিত্ব বৌদ্ধ প্রভাবের কথা স্মরণ করায়। অবশ্য মন্দিরগুলি যখন নির্মিত হয়েছিল তখন পার্বত্য ত্রিপুরার চারধারে মুসলমান রাজত্ব, এবং ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত বলা চলে, তাই তৎকালে নির্মিত মন্দিরসমূহে বৌদ্ধপ্রভাব আমাদের বিস্মিত করে।

মুসলমান রাজাদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের যোগাযোগ যে ঘনিষ্ঠ ছিল, রত্নফা-র ত্রিপুরা সিংহাসন আরোহণের ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। পরবর্তী সময়ে এই যোগাযোগ কমে নি, বরং শাসনকার্য পরিচালনায় রাজারা মুসলমানদের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, অবশ্য বাংলার সুলতানদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল, বিশেষ করে মুকুন্দমাণিক্যের সময় থেকে বাংলার নবাবদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

(দি হিস্‌টি অব বেঙ্গল প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৯৫ দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরের নিদর্শন প্রচুর না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যা আজও বিদ্যমান। ত্রিপুরায় উক্ত চারধরনের মন্দিরের নিদর্শন অনুপস্থিত, এসব অঞ্চলে যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছে তার প্রাচীনতমটি বোধ হয় খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। সেজন্য ত্রিপুরার মন্দিরের স্থাপত্যগত সাদৃশ্য পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাঙলাদেশে মুসলমান আগমনের পর যে পর্বের শুরু সেই পর্বে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে অনুসন্ধেয়।

বাংলাদেশে মধ্যপর্বে (মুসলমান বিজয়ের পর) বাঙালী স্থপতিরা এক নতুন ধরনের মন্দির নির্মাণ শৈলী প্রবর্তন করেন। বাংলার গ্রামে গঞ্জে শহরে চতুষ্কোণ বা আয়তাকার নকশার ভিত্তিতে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির সঙ্গে মাটির দেয়াল বা বাঁশের বেড়ার উপর ধনুকাকৃতি দোচালা, চার চালা বা আট চালা ঘর দেখা যায়। বাঙালী ঘরের দেবতাদের এইসব সাধারণ কুঁড়ে ঘরে' রাখা হতো। কালক্রমে চালা ঘরের আকৃতি অনুকরণ করে স্থপতিরা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আলয় নির্মাণে সচেষ্ট হন, ফলে যে রীতির উদ্ভব হয় ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে তা বাংলারীতি নামে পরিচিত। স্থানীয় স্থাপত্য প্রবণতাকে মুসলমানগণ যথেষ্ট আয়ত্ত করেছিলেন, এবং সেই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তার প্রমাণ হিসাবে একলখীর সমাধিসৌধের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সমাধি সৌধটি উল্লেখযোগ্য প্রধানত এর বিশেষ স্থাপত্য শৈলীর জন্য, এখনও পর্যন্ত দণ্ডায়মান কুটিরচালার স্থায়ী স্থাপত্য রূপায়নের সর্বপ্রাচীন উদাহরণ এটি, এবং এই স্থাপত্যশৈলীটি বাংলাদেশে ইসলামিক স্থাপত্যের আদিরূপ বলে বিবেচিত। অতিরিক্ত বর্ষণের অবিরল জলধারা অপসারিত করার জন্য বক্রাকার চালের গঠন বিশেষ উপযোগী, এজন্য একটি বিশেষ ধরনের পাকা ছাদের গড়ন দরকার, এবং কালক্রমে এই বক্রাকার ছাদ প্রথা হয়ে দাড়াল। (পার্সি ব্রাউন, ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার, ইসলামিক পিরিঅড, পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য)। পাল ও সেন আমলে যে পরিমাণ দেবমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই সংখ্যায় মন্দির অনুপস্থিত, ফলে মূর্তিগুলি যে সাধারণ বাঁশ খড়ের দোচালা চারচালা কুটিরে রাখা হতো তাতে সন্দেহ নেই, কারণ প্রাক মুসলমান পর্বে কুটির সদৃশ পাকা মন্দির নির্মিত হয়েছিল কিনা বলা শক্ত, তবে আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত 'দ্রৌপদীর রথ' (মহাবলীপুরম্) কুটির উদ্ভূত রীতির একটি সবলতম প্রকাশ, তবে এর আল্‌সেগুলো বাংলারীতির মতো বক্রাকৃতি নয়, সরল। এর আদর্শ অবশ্য খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের সাঁচি ফলকের গ্রামীণ স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়, "জেতবনের আম্র ও চম্পক কুঞ্জে অবস্থিত, অনাড়ম্বর স্থাপত্য শিল্পে অলঙ্কৃত—গন্ধকুটী, কোশাম্বকুটী এবং করোরিকুটী নামক বুদ্ধদেবের সঙ্ঘের কার্যে উৎসর্গীকৃত কুটীরত্রয়। চিত্রের উপবিভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকা বামপার্শ্বে যোড়করে দণ্ডায়মান জেত-

৩

বাংলা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ বহু দিনের। পার্বত্য ত্রিপুরা যখন ঐক্যবদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্যে পরিণত হয়নি, তখন সন্নিহিত অঞ্চলের রাজন্যবর্গের আধিপত্যের ক্ষেত্র যে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়েই শুধু নয়, ভাষার দিক দিয়েও বাংলা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ কয়েক শতাব্দীর। ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তিপ্রা ও রিয়াংদের ভাষা ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্গত বড়ো পরিবারভুক্ত। এসব ভাষার লিখিত রূপ নেই, যে আয়াস ও প্রযত্নে মৌখিক ভাষা লিখিতস্তরে উন্নত হয়, তা এ অঞ্চলের মূল অধিবাসীদের অথবা তাদের প্রধান কিংবা রাজাদের ছিল না, উপরন্তু এইসব ভাষাভাষীরা ক্রমে বাংলা ভাষা গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকছিলেন, এবং ত্রিপুরা রাজপরিবার তাদের সংস্কৃতি ও আদালতের ভাষা হিসাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। (দ্য স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, পৃঃ ৩৮২ দ্রষ্টব্য)। এর ফলে বাংলা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ নিবিড় হয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ একটি বিশেষ ভাষার মাধ্যমে সেই ভাষাভাষীর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে দ্রুত গতিতে, তাই ত্রিপুরায় বাংলা দেশের প্রভাব পড়েছিল নানাভাবে প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে। আর রাজাদের আর্যীকরণের তৎপরতায় তার গতিবেগ ত্বরান্বিত হয়েছিল। মন্দির নির্মাণে বাংলা মন্দির-স্থাপত্যের প্রভাব পড়া এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় তা বলা বাহুল্য।

প্রাচীন কালে বাংলা দেশে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু তার প্রায় সবগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েকটি মন্দির (ভগ্ন, অর্ধভগ্ন) মাত্র অবশিষ্ট আছে। উৎকীর্ণ লিপি ও সাহিত্যে কয়েকটি মন্দিরের জাঁকজমকের উল্লেখ আছে, অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত মন্দিরের চিত্র সমসাময়িক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। এই সব মন্দিরের আকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রাক্-মুসলমান পর্বে সাধারণত চার ধরনের মন্দির নির্মিত হতো। শ্রীসরসীকুমার সরস্বতীর মতে এগুলি হচ্ছে :

১। ভদ্র বা পীড় দেউল—এই রীতি অনুযায়ী গর্ভগৃহের চাল পিরামিডাকৃতি হয়ে ধাপে ধাপে উঠে যায় এবং মস্তক অংশে আমলক সহ যথাবিহিত উপাঙ্গ থাকে।

২। রেখ বা শিখর দেউল—গর্ভগৃহের দেয়াল কিছু দূর খাড়া উঠে গিয়ে পরে ক্রমে ভেতরের দিকে ঝুঁকে শিখরাকৃতি হয়ে উপরে উঠে যায়, শিখর অংশে বেকি, আমলক, কলস, পতাকা প্রভৃতি উপাঙ্গ থাকে।

৩। স্তূপযুক্ত ভদ্র বা পীড় দেউল।

৪। শিখরযুক্ত ভদ্র বা পীড় দেউল।

এই চার ধরনের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরের নিদর্শন প্রায় বিরল।

হরি মন্দির। উদয়পুর

ভুবনেশ্বরী মন্দির

বনের ভূতপূর্ব অধিকারী জেবের নিকট হইতে জেতবন ক্রয় করিয়া ধর্ম ও সঙ্ঘের কার্যের কুটীবগুলি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিজনবর্গ নিম্নে দৃশ্যমান। নিম্নভাগে দক্ষিণপার্শ্বে দৃশ্যমান চালা-কুটীরের সমতুল বহুসংখ্যক কুটীব বঙ্গদেশেব ও মালাবার প্রদেশের নানাস্থানে পরিদৃষ্ট হয়। মহাবলীপুরের একটি বথ-মন্দির উক্ত কুটীরেব আদর্শে নির্মিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে অঙ্কণ চিত্র কিরূপ উন্নত হইযাছিল কুটীরের পরিপ্রেক্ষিত দৃশ্য হইতে তাহা প্রতীযমান হয।" (শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবায়তন ও ভারতসভ্যতা, পৃঃ ১৫১)। মোগল আমলে কুটীরের আদলে বাংলা দেশে প্রচুর মন্দির নির্মিত হয়েছিল; বিশেষ করে স্থানীয় উপকরণ (পাথরেব পরিবর্তে ইঁটের ব্যবহার) ও আবহাওয়াব (সেঁতসেঁতে) জন্য বাংলাদেশের অট্টালিকাকে সুদূর আকাশ-গামী করা সম্ভব নয়, এমনকি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তার আয়তনও সীমিত করা হয়। অন্যদিকে বাংলা মন্দিরের ভারবহন ক্ষমতা অল্প, সেজন্য এই রীতির মন্দির নাগব, বেসব বা দ্রাবিড় রীতির মন্দিরের মতো দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় বিরাটত্ব অর্জন করে নি। অবশ্য ইঁট দিয়ে বৃহদায়তন অট্টালিকা বা মন্দিব নির্মাণ সম্ভব, তাব প্রমাণ হিসাবে পাহাড়পুরেব নাম উল্লেখ কবা চলে। কিন্তু পাহাড়-পুব কিংবা বিহারের নালন্দা ইঁটের তৈরী অট্টালিকার মধ্যে ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য, যেহেতু এই শ্রেণীব ইঁটের তৈরি মন্দির বা ইমারত আর দেখা যায় না। এজন্য আমাদেব ক্ষোভ থাকলেও বিশেষজ্ঞদেব মতে বাংলার স্থাপত্য রীতি ভারতীয় স্থাপত্যের একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র রীতি হিসাবে গণ্য।

কুটিরের নির্মাণ রীতি অনুকরণ করে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য শৈলীর মধ্যে দো-চালার প্রবর্তন প্রথমে হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ খড়ো ঘরের সবচেয়ে সহজ রূপ হচ্ছে এই দো-চালা। দো-চালায় অনুকরণে যে মন্দির নির্মিত হয়েছে তাকে 'এক বাংলা' মন্দির বলা হয়ে থাকে। ত্রিপুরায় এ শ্রেণীব মন্দির চোখে পড়ে না। কেবল হরিমন্দির (জগন্নাথ দাঘির পুব পাড়ে, উদয়পুর)-এর তোরণটি দোচালা ধরনের। উদযপুরে আওলিয়া বদর সাহেবের যে মোকাম, সেই মোকামটি ইঁটেব তৈরি দো-চালা। "আতারাম ও বুধিবাম নামক দুই সহোদর নরসুন্দর, বদর সাহেবের অলৌকিক গুণে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত. এই মোকামের খাদিম অর্থাৎ সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদেরই বংশধরগণ অদ্যাপি এই মোকামের খাদিমের কার্য্য করিতেছে বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।" (শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, উদয়পুর বিবরণ, পৃঃ ১৯-২০)। দো-চালার মতোই 'এক বাংলা' মন্দিরের ছাদ কচ্ছপের পিঠের মতো উত্তল।

পাশাপাশি সংযুক্ত দু-টি 'এক বাংলা' মন্দিরকে সাধারণভাবে 'জোড় বাংলা' মন্দিব বলা হয়। 'জোড় বাংলা'র ধরন যে এক বাংলার পরবর্তীরূপ তা বলাই বাহুল্য। 'এক বাংলা' মন্দির যথেষ্ট দৃঢ় হতো না বলেই হয়তো 'জোড় বাংলা

মন্দির নির্মিত হতো, হয়তো সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ শ্রেণীর মন্দির নির্মিত হয়ে থাকবে। বাংলা দেশে এক বাংলা মন্দিরের নিদর্শন মাত্র দু একটি পাওয়া গেলেও জোড় বাংলা মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন লক্ষ করা যায়। বাংলার এই নিজস্ব নির্মাণ রীতি (বিশেষত বাঁকা আলসে) মোগল আমলে ক্রমে ক্রমে দিল্লী, রাজস্থান, গুজরাট অঞ্চলের স্থাপত্য রীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। 'জোড় বাংলা' মন্দিরের অবশ্য কোনও নিদর্শন ত্রিপুরায় দেখা যায় না।

'এক বাংলা' 'জোড়-বাংলা'র পর বাংলার স্থাপত্য শৈলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চালা ধরন। 'এক বাংলা' বা 'জোড়-বাংলা' উভয়ই চালা মন্দির, তবু চালা মন্দির বললে আমরা সচরাচর চার চালা, আট চালা মন্দির বুঝে থাকি। আজও বাংলা দেশের সর্বত্র চারচালা কুঁড়ে ঘর দেখা যায়। সাধারণ ভাবে মাটির দেওয়াল ও চারটে খড়ের চালে নির্মিত কুটির চারচালা নামে পরিচিত। ইঁটের মন্দির তৈরির সময় সেই একই রীতি অনুসৃত হয়, তবে ঘরের ত্রিকোণ চারচালা যেমন একই বিন্দুতে অথবা কিছু ব্যবধানে অন্য একটি বক্রাকৃতি নির্মাণের সাহায্যে শীর্ষে মিলিত করা হয়, চারচালা মন্দিরে তেমন সুবিধা নেই, চালার নিম্ন প্রান্তের বক্রাকৃতি লক্ষ করে আমরা এইসব মন্দির যে চারচালা তা বুঝতে পারি। চালা বা রত্ন মন্দিরের বিশেষত্ব বাঁকানো আলসের (কার্নিস) গড়নে, এবং বাঁকানো আলসে বাংলাদেশে ইসলামী অট্টালিকার একটি বিশেষত্ব। এই বিশেষ ধরনের আলয়ের আদিরূপ হচ্ছে বাঁশ কিংবা কাঠের তৈরি বাড়ি, বাংলা দেশে যা অতি প্রাচীনকাল থেকে ঘর বাড়ি তৈরিতে ব্যবহার হয়ে আসছে। কুঁড়ে ঘর আকৃতির চালা বাংলা দেশেরই বিশেষত্ব বলতে হবে। (শ্রীসরসীকুমার সরস্বতীর প্রবন্ধ, দ্য দিললী সুলতানেৎ, পৃঃ ৬৯৮ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে অনুসৃত চালা রীতির নিদর্শন আছে, তবে এগুলির আলসে বাংলা দেশের আলসের মতো বক্রাকৃতি নয় তা আগেই বলা হয়েছে। বাংলা দেশে শুধু চার চালা মন্দির বিরল হলেও চার চালার উপর এক চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। "বাঁকুড়ার মন্দির" গ্রন্থের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, "বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন রীতির তাবৎ দেবালয়ের মধ্যে এই শ্রেণীর মন্দিরের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। (পৃঃ ১০৩)। এই মন্দিরের নির্মাণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে "বাঁকানো কার্নিসযুক্ত চারটি চালার কেন্দ্রস্থলে একটি চূড়া স্থাপন করাই এ মন্দিরগুলির বিশেষত্ব। অপর একটি বিশেষত্ব চালাগুলির ঢালের (Slope) হ্রাস। চূড়াটি ষটু কোণাকৃতি, অষ্ট কোণাকৃতি, বেলনাকৃতি (cylindrical) প্রভৃতি গঠনের হতে পারে। ... উচ্চাবচ কার্নিসের ব্যবহারে চূড়ার শিখরদেশে সমান্তরাল রেখায় সেই একই রকম (পীঢ়া দেউলের মতো—সংযোজন আমার) আলোছায়ার সন্নিবেশ এ স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ..." (বাঁকুড়ার

মন্দির, পৃঃ ১০৩)।

রত্নমন্দিরের উদ্ভব চালামন্দিরের পরবর্তী সময়ের, কারণ চার-চালার নিরাভরণ কোণগুলি ভরাট ও অলংকৃত করার জন্য চারকোণে চারটে চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রস্থলে আর একটি চূড়ার পরিকল্পনার করা হয়েছে। 'পঞ্চরত্ন', 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন' প্রভৃতি বহু রত্ন-যুক্ত মন্দির বাংলাদেশে দেখা যায়। ত্রিপুরায় রত্নমন্দির বা আট-চালা মন্দিরের কোনও নিদর্শন চোখে পড়ে না।

ত্রিপুরায় যে মন্দির-(ভগ্ন, অর্ধভগ্ন এবং অক্ষত) সমূহ লক্ষ করা যায়, তার সব গুলি চার-চালা মন্দির, সেক্ষেত্রে মধ্য যুগের বাংলারীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু চালার উপর স্থাপিত অংশটিই ত্রিপুরার মন্দিরসমূহকে বিশেষত্ব দান করেছে। চার-চালার উপর বৌদ্ধ স্তূপের বিবর্ধিত রূপের নিদর্শন ত্রিপুরা ছাড়া ভারতে আর কোথায়ও পাওয়া যায় না, এবং ত্রিপুরায় নির্মিত অসংখ্য মন্দির সেই একই রীতিতে নির্মিত, সেজন্য আমরা স্বচ্ছন্দে এই মন্দির স্থাপত্য রীতিকে ত্রিপুরারীতি বা ত্রিবেগরীতি নামে অভিহিত করতে পারি।

চার-চালার উপরে স্থাপিত ঈষৎ রূপান্তরিত স্তূপের অস্তিত্বে বাংলারীতির সঙ্গে বৌদ্ধরীতির আশ্চর্য মিলনের বিষয়টি আমাদের গোচরে আসে। কিন্তু ত্রিপুরার মন্দিরে শুধু, বাংলা রীতির সঙ্গে বৌদ্ধ রীতিরই মিশ্রণ ঘটে নি, মন্দিরসমূহে এমন উপাঙ্গ আছে যা হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে দেখা যায় না। হিন্দু মন্দিরের চার-কোণায় ঠেসনা (Buttres) দেখা যায় না, কিন্তু ত্রিপুরার মন্দিরে ঠেসনা লক্ষ করা যায়, এবং এগুলি যে মুসলিম মিনারের অনুকরণ, সেবিষয়ে অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। (টেম্পলস্‌ অব ত্রিপুরা পৃঃ ১৮ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য মুসলিম স্থাপত্য বাংলারীতির মাধ্যমেও চোলাই হয়ে এসেছে। উদয়পুরের জগন্নাথ মন্দিরের স্থাপত্যে ইসলামী রীতির প্রভাব পড়েছে, সেকথা কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন, "It is built in a style characteristic of later Mohammedan period. It is square in plan with a passage on the east, facing entrance, and recesses in the walls on the other three sides. The top is crowned with a dome with a vaulted roof in pure Mohammedan fashion." শ্রীরাজমালা চতুর্থলহর, পৃঃ ৯০, দ্রষ্টব্য)। ত্রিপুরার মন্দিরস্থাপত্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান স্থাপত্যের আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটায় মন্দিরগুলি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং এই ক্ষুদ্র রাজ্যে একটি বিশেষ রীতির মন্দির দেখা যায় বলে মন্দিরের স্থাপত্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে ত্রিপুরার মন্দিরে বাংলারীতির প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও ইসলামী রীতি মিশ্রিত হয়ে এক নতুন স্থাপত্য রীতি (যাকে ত্রিপুরা বা ত্রিবেগ রীতি বলা যায়)

গড়ে উঠেছে, হয়ত আদিবাসীদের ঘরবাড়ি নির্মাণেরও প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মন্দিরের স্থাপত্যরীতি নতুন রসদ জোগাবে কিনা, তা ঐতিহাসিকের সঠিক বলতে পারেন।

৪

প্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহের বিশদ পরিচয় দেবার আগে মন্দিরের বহিঃরূপ সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা বাঞ্ছনীয়, কারণ ঐ আলোচনায় মন্দিরের বিশেষত্ব নজরে পড়বে সহজে। ত্রিপুরার সব মন্দিরই দীঘি বা নদীর ধারে অবস্থিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্দিরগুলি সুউচ্চ বাঁধানো চত্বরের উপর স্থাপিত এবং বেষ্টনী প্রাচীর আছে। মন্দিরের প্রবেশের জন্য তোরণ নির্মিত হতো, ইঁটের কখনো কখনো শ্লেট জাতীয় পাথরে তৈরি। তোরণগুলি বেশিরভাগ চারচালা, কেবল জগন্নাথ দীঘির পুব পারে অবস্থিত হরি মন্দিরটির তোরণ দোচালা। প্রায় মন্দিরের তোরণ সিঁড়ি যুক্ত, সেই সিঁড়ি বেয়ে বাঁধানো প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মন্দিরের বহির্গৃহ। বহির্গৃহ ও গর্ভগৃহ অন্তরাল দিয়ে যুক্ত, এবং উভয়ের ছাদ চার চালা ধরনের। গর্ভগৃহের চারকোণে চারটে গোলাকার আলম্ব বা ঠেসনা (buttress), যেগুলি অনেকটা মোমবাতির মতো দেখতে অর্থাৎ যেগুলির স্ফীতি নীচের দিক থেকে উপরের দিকে ক্রমশ হ্রাসমান। ঠেসনার উপর কলস, এবং কলসের উপর যেন ছাদের বাঁকানো আলসে স্থাপিত, অথবা বাঁকানো আলসে ঠেসনার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আলসে বহুতবক (multifoil) বিশিষ্ট। বহির্গৃহের সামনে দুধারে অনুরূপ দুটি ঠেসনা দেখা যায়। বেশিরভাগ মন্দিরগাত্র নিরাভরণ, তবে কোনও কোনটির নিরাভরণতা দূর করার জন্য কয়েকটা আনুভূমিক (horizontal) পত্ত্কা এবং উদ্গত সরল রেখা বা কারুকর্মখচিত নকশা বা গোলাপ বা পদ্ম-আঁকা ছোট ছোট চতুষ্কোণ ফলক দিয়ে দেওয়াল সাজানো হয়েছে। অলঙ্করণ যে সর্বদা সুদৃশ্য হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। প্রতিটি মন্দিরের অবয়ব-সংস্থান প্রায় অনুরূপ। বহির্গৃহ ও গর্ভগৃহের চার-চালার উপর বৌদ্ধ স্তূপের বিবর্ধিত এক বিশেষ নির্মিতি লক্ষণীয়। বর্তমানে বহু মন্দিরের আবেষ্টনী প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেলেও, প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। উদয়পুরের বিখ্যাত মহাদেব বাড়ির প্রাচীর এখনও বিদ্যমান। জগন্নাথ দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত "জগন্নাথ-বাড়ির চতুর্দিক ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত দেয়াল্ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পশ্চিম দিকের দেয়ালের ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া বর্তমান সড়ক নির্মিত হইয়াছে।" (শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, উদয়পুরবিবরণ, পৃঃ ১৬ ; এবং শ্রীরাজমালা, চতুর্থ লহর, পৃঃ ৯১ দ্রষ্টব্য)।

ত্রিপুরার মন্দিরে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বিশেষ করে উদয়পুরে কয়েকটি গুচ্ছ-মন্দির (group of temples) দেখা যায়। একই
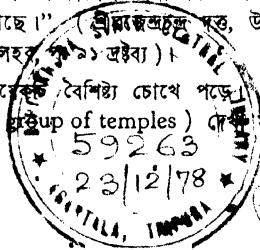
আবেষ্টনীর মধ্যে দুটি বা তিনটি মন্দির অনেকগুলি দেখা যায়, তার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ধর্মাশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে একই সঙ্গে দুটি মন্দির, মহাদেব বাড়ি গুচ্ছ, দুত্যার বাড়ি, গুণবতী গুচ্ছ, গুণবতী গুচ্ছ পেরিয়ে লোক-পালানো ঝুলন সহ দু-টি মন্দির, গোমতীর দক্ষিণ পারে (মোগল মসজিদের ঠিক বিপরীত তীরে) পাশাপাশি তিনটি মন্দির প্রভৃতি মন্দির গুচ্ছ-মন্দিরের নিদর্শন। এ-ছাড়া প্রধান প্রধান মন্দিরের আবেষ্টনীর মধ্যে আর একটি নির্মিতি লক্ষ করা যায়, এ গুলিকে স্থানীয় লোকেরা নাট-মন্দির বলে থাকেন। এই নাট-মন্দির উড়িষ্যার জগমোহনের অনুরূপ, "এই মন্দিরের সামনে (চতুর্দশ দেবতার মন্দির—আমার সংযোজন) এক চিলছত্র নির্মাণ করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'জগমোহন'।" (শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, পৃঃ ১৬৬)। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে যে নাট-মন্দির ছিল, সে কথা "শিলালিপি-সংগ্রহ"-এর সঙ্কলক শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে একটি নাট-মন্দির। নাট-মন্দির অতিশয় জীর্ণ হইয়াছিল, বর্তমান মহারাজা তাহা ভাঙ্গিয়া পুনর্বার নির্মাণ আদেশ দিয়াছেন ; নির্মাণ কার্য চলিতেছে।" (নতুন সং, পৃঃ ১)। জগন্নাথ মন্দিরেরও নাট-মন্দির ছিল, "মন্দিরটি পূর্বদ্বারী, ইহার সম্মুখে নাট-মন্দির এবং দেবদেবীর প্রতিমূর্তি বিশিষ্ট কারুকার্য খচিত বোলং ছিল।" (শ্রীরাজমালা, চতুর্থলহর, পৃঃ ৯১)।

মন্দিরের প্রাচীর ও নাটমন্দির নির্মাণ মনে হয় উড়িষ্যা শৈলীর প্রভাব সঞ্জাত। বাংলা দেশের মন্দিরগুলির জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ থাকে না, অবশ্য কোথাও জগমোহনের বদলে সামনের দিকে বারান্দা আছে। ত্রিপুরার রাজারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর সপরিবারে পুরী তীর্থে দর্শনে যেতেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে অবস্থিত গোপীনাথ মন্দিরে ত্রিপুরার রাজা রামগঙ্গা মাণিক্যের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি আছে। শিলালিপি এরকম :

"জিলে ত্রিপুরার মোহারাজা সরকার
উদয়পুর শ্রীল শ্রীরামগঙ্গা মাণি
ক্য ভ্রাত শ্রীল কাশীচন্দ্র ঠাকুর
শ্রীমতি ইন্দুরিনা তারা রাজ কু
মার শ্রীল কৃষ্ণ কিশোর ঠাকুর
ইতি সন ১২২৬ সন তারিখ ১৬ শ্রাবণ ॥"

(শিলালিপি-সংগ্রহ, পৃঃ ৫৩)। "ত্রিপুরাবাসীরা মহাপ্রভুর দর্শনে গিয়াছিল।" (চৈ. ভা. অ ৯।২৩৪)," (শ্রীহরিদাস দাস, মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় সাহিত্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান, পৃঃ ৪৬)। উড়িষ্যার নাটমন্দির যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো, ত্রিপুরায় নাটমন্দির সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার হলেও তা

যে জগমোহন রূপেও ব্যবহার হতো, মহাদেব বাড়ির বর্তমান নাটমন্দির দেখলে বোঝা যায়। মন্দিরগুলির বেশির ভাগই কল্যাণমাণিক্য, গোবিন্দ-মাণিক্য বা তার সমসাময়িক কালের রাজাদের দ্বারা নির্মিত। রাজধরমাণিক্যই বোধহয় সরকারিভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন।

"বিষ্ণুমন্ত্রেতে দীক্ষা ছিল মহারাজা।
পরম বৈষ্ণব সাধু বা হিংসয়ে প্রজা॥
সাধুর চরিত্র রাজার বৈষ্ণব আচার।
পাত্র মিত্র সৈন্য বশ করে আপনার॥"
(শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, রাজধরমাণিক্যখণ্ড, পৃঃ ৫০)

পরবর্তী মাণিক্য রাজারা রাজধরের পথই অনুসরণ করেছেন। মহারাজারা অসংখ্য বিষ্ণু, হরি ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, এবং তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আনুগত্য এ থেকেও সহজে অনুমান করা যায়। ফলে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র নীলাচলের মন্দির স্থাপত্যরীতির প্রভাব এ অঞ্চলের মন্দিরস্থাপত্যে বর্তাবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

অনেকগুলি মন্দিরের গর্ভগৃহ বৃত্তাকার, অবশ্য গর্ভগৃহের বাহিরের অংশ চতুষ্কোণ। বৃত্তাকার গর্ভগৃহ বৌদ্ধ প্রভাবের ফল কিনা বলা দুষ্কর। তবে মধ্য ভারতে বৃত্তাকার আকৃতি ও নকশা যুক্ত মন্দির দেখা যায়। এর মধ্যে রেওয়া শহর থেকে ১২ মাইল পুবে গুরজি মাসাউন এবং পুরণো রেওয়া রাজ্যের চান্দ্রেহে-র মন্দির দু'টি উল্লেখযোগ্য। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য "দ্য স্ট্রাগল ফর এম্পাআর, পৃঃ ৫৭৩-৫৭৪ দ্রষ্টব্য)।

৫

উদয়পুর মহকুমার প্রধান শহর উদয়পুর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বহু দেবালয় দেখা যায়, এর মধ্যে অধিকাংশ ভগ্ন, জীর্ণ; মাত্র কয়েকটি পুরাতত্ত্ব-বিভাগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। আরও দু-একটি মন্দিরের (যা বর্তমান অবস্থাতেও রক্ষা করা চলে) ভার পুরাতত্ত্ব বিভাগ গ্রহণ করলে ভালো হয় নিশ্চয়ই। ভগ্ন, অর্ধভগ্ন এবং অক্ষত মন্দিরের সংখ্যা বিচারে ত্রিপুরার মধ্যে উদয়পুর অগ্রগন্য, এবং অত্যন্ত সীমিত এলাকায় সচরাচর এতগুলি মন্দির দেখা যায় না, তাই উদয়পুরকে ত্রিপুরার মন্দিরপুর বললে অত্যুক্তি হয় না। এরাজ্যে প্রায় সমস্ত মন্দির একই রীতিতে নির্মিত, সেজন্য অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ মন্দিরের বিবরণ দিয়ে আলোচনা শুরু করা যুক্তিযুক্ত।

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির (উদয়পুর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে) একটি নাতি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। মন্দিরটি ধন্যমাণিক্যের সময় ১৪২৩ শকে (১৫০১-২ খৃঃ) নির্মিত হয়, তারপর ১৬০৩ শকাব্দে (১৬৮১ খৃঃ মন্দিরটিকে একবার মনোজ্ঞ করা হয়। এরপর প্রায় পৌনে দু-শ বছর পরে ১৭৭৯ শকে

(১৮৫৭ খৃঃ) মন্দিরটি পুনরায় সংস্কার করা হয়। কথিত আছে মন্দিরটি বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু—

"ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমা স্থাপ রাজা মহাসত্বে॥
চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট॥
তথা হইতে আনি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর যেই মত ভজ॥

(শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয়লহর, ধন্যমাণিক্যখণ্ড, পৃঃ ৩০)

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রাজা বিষ্ণুর জন্য নির্মিত মঠে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের প্রাচীন চিত্রে গর্ভগৃহ সংলগ্ন মণ্ডপ দেখা যায়, যদিও মণ্ডপটির কোনও চিহ্ন এখন আর নেই। মন্দিরটি পশ্চিম মুখো, এবং একটি অনুচ্চ বাঁধানো চত্বরের উপর এভাবে স্থাপিত যে দর্শনার্থী অনায়াসে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে পারেন। গর্ভগৃহের অভ্যন্তর বৃত্তাকার হলেও বাইরের চারকোণে চারটে ঠেসনা বা আলম্ব আছে। দেয়ালের এপাশ ওপাশ জুড়ে সমান দূরত্বে আনু-ভূমিক ও সামঞ্জস্য রেখে ছোট ছোট খাড়া বা উল্লম্ব (vertical) পর্শ্বকারেখা নানা আকারের আয়তক্ষেত্র রচনা করেছে। অন্যদিকে ঠেসনার গায়েও কিছুদূর অন্তর অন্তর আনুভূমিক উদ্গত রেখা প্রায় বৃত্তাকার হয়ে ঠেসনার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। ঠেসনার মাথায় ওল্টানো কলস, সেই কলসের উপর চার-চালা বিন্যস্ত। চারচালার ঠিক মধ্যিখানে বৃত্তাকার বেদীর উপর মোচাকৃতি (conical) অণ্ড, অণ্ডের মূল বা পাদদেশে শ্রেণীবদ্ধ ছোট ছোট কুলঙ্গি অণ্ডকে অনেকটা পদ্মের পাপড়ির আকার দিয়েছে। অণ্ডের উপর আমলককে প্রলম্বিত করে মোচাকার করা হয়েছে, বিশেষত অণ্ডের গঠনের সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য। আমলকের সারিবদ্ধ লম্বা লম্বা উচ্চাবচ উত্তল বক্ররেখা স্পষ্ট দেখা যায়। আমলকের উপর করণ্ড, এবং সর্বোপরি পতাকা। আমলকটি যে এখানে প্রলম্বিত হর্মিকা, অথবা চতুষ্কোণ হর্মিকাটি মোচাকার অণ্ডের সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য লম্বিত করা, তা মন্দিরের সমগ্র মস্তক অংশটি পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। শীর্ষ অংশটি বৌদ্ধ স্তূপেরই বিবর্ধিত রূপ, মন্দিরটি যে অনেক সময় বর্মী প্যাগোডা বলে ভুল হয়, তার মূল কারণ মন্দিরের উপস্থিত স্তূপটি। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নেই বলে শুধু সন্দেহটি উত্থাপন করা হলো।

এরপর উল্লেখযোগ্য মন্দিরের নাম মহাদেব বাড়ি (উদয়পুর)। মহাদেব বাড়ি প্রাচীর বেষ্টিত, এবং শিবমন্দির ছাড়া এই বেষ্টনীর মধ্যে আর দু-টি মন্দির আছে। মহাদেব বাড়ি মহাদেব দীঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত। প্রাচীরের তোরণটি চারচালা, এবং প্রবেশপথ ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত। খিলানের ঠিক

উপরে সামনের দেয়ালে প্রস্তরফলকে খোদিত লিপি দেখা যায়। লিপিগুলি যথেষ্ট বিকৃত হওয়ার জন্য পাঠ করা প্রায় দুঃসাধ্য, তবে ফলকে 'শ্রীশ্রীকল্যাণ দেব'-এর নাম দেখে বলা চলে, প্রাচীরটি কল্যাণমাণিক্যের সময় নির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাফলকের দু-পাশে পদ্মফুল আঁকা ছোট ছোট চতুষ্কোণ ফলক শোভাবৃদ্ধি করেছে। তোরণ দিয়ে ঢুকে আয়তাকার নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরের ছাদ নেই, তবে ছাদের গড়ন চার-চালা-ই হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তোরণ দিয়ে নাট মন্দিরে ঢুকে সামনে যে বড় মন্দিরটি চোখে পড়ে স্থানীয় লোকে তাকে চতুর্দশ দেবতার মন্দির বলে। নাট-মন্দির পেরিয়ে বাঁধানো চত্বরের উপর মন্দিরটি স্থাপিত, চত্বরের চারদিকে দেড় কিংবা দু ফুট উঁচু দেয়াল, চত্বর দিয়ে সমগ্রমন্দির অনায়াসে প্রদক্ষিণ করা চলে। মন্দিরের বহির্গৃহের প্রবেশপথ খিলানযুক্ত, বহির্গৃহের দেয়ালের নিরাভরণতা দূর করার জন্য পাঁচটি আনুভূমিক উদ্গত পঙ্‌ক্তি সমান দূরত্বে টানা হয়েছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখো। বহির্গৃহের সম্মুখে পূব ও পশ্চিম কোণে দুটি ঠৈসনা (বর্তমানে ভগ্ন), বাঁকানো আলসে ও সর্বোচ্চ পঙ্‌ক্তির মধ্যে চতুষ্কোণ প্রতিষ্ঠাফলকটি স্থাপিত। বহির্গৃহের উপরে গর্ভগৃহের অনুরূপ চার-চালা ও স্তূপ (স্তূপের অণ্ড অংশ ব্যতীত অন্য অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত) গর্ভগৃহের দেওয়ালেও আনুভূমিক সমান্তরাল উদ্গত পঙ্‌ক্তি রেখা আছে। এই রেখাগুলির মধ্যে কেবল দু-টি সমস্ত দেয়ালে অবিচ্ছিন্নভাবে ধাবিত, অন্য রেখাগুলি বহির্গৃহের ও গর্ভগৃহের সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রসারিত। গর্ভগৃহেও চারদিকে গোলাকার ঠৈসনা, যার স্ফীতি নীচ থেকে উপরে ক্রমশ হ্রাসমান। ঠৈসনার গায়ে সমান দূরত্বে পঙ্‌ক্তি রেখা, ঠৈসনার মাথায় কলস, কূর্মাকৃতি চালার প্রলম্বিত অংশ ঠৈসনার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চালার উপর গোলার্ধ-আকার (hemispherical) অণ্ড, তার উপর ছোট্ট ঘটের (যার উদর অংশ ঈষৎ স্ফীত) মতো আমলক, আমলকের ঊর্ধ্বঅংশ ভগ্ন। মন্দিরটি ১৫৭২ শকে (১৬৫০খৃঃ) কল্যাণমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি নির্মাণ করে কল্যাণমাণিক্য গোপীনাথের উদ্দেশ্যে দান করেন। (শিলালিপি সংগ্রহ, পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য)। ঐ একই আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটিও দক্ষিণমুখো, এবং গড়ন চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের মতোই। তবে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যেমন—মন্দিরটি বাঁধানো চত্বরের উপর স্থাপিত নয়, বহির্গৃহে কোনও প্রতিষ্ঠাফলক নেই। মস্তকে অণ্ডের পাদদেশে সারিবদ্ধ কুলঙ্গি আছে। অণ্ডের উপরের অংশ ভগ্ন। গর্ভগৃহের বক্রাকার আলসের নীচে সারিবদ্ধ ছোট ছোট ত্রিভুজাকার অলঙ্করণ দেখা যায়। মন্দিরটি সম্ভবত মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য ১৫৯৫ শকে (১৬৭৩ খৃঃ) নির্মাণ করেন।

শিবমন্দিরটিও প্রায় একই রীতিতে নির্মিত। শুধু মস্তক অংশে কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়ে। অণ্ডের উপর একটি বৃত্ত, তারপর গোলাকার হর্মিকা। হর্মিকার

গুণবতী গুচ্ছ মন্দির

উপর পুষ্প জাতীয় নকশা (দীর্ঘায়িত পদ্মের পাঁপড়ি), যার গতি উপর থেকে নীচের দিকে। এর উপর পতাকা দণ্ড ও পতাকা বিন্যস্ত। কথিত আছে মন্দিরটি ধন্যমাণিক্য নির্মাণ করে ছিলেন। মন্দিরটি সম্ভবত ১৫৭৩ শকে (১৬৫১ খৃঃ) কল্যাণমাণিক্য সংস্কার করেছিলেন।

সারা ত্রিপুরার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্দির হচ্ছে উদয়পুরের জগন্নাথ বাড়ি। যা "জগন্নাথের দোল" নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরায় এই একটি মাত্র মন্দির পাথর দিয়ে তৈরি। অন্যান্য মন্দিরের চেয়ে এর কাঠামো গড়ন সবকিছু প্রকাণ্ড। মন্দিরটি জগন্নাথ দীঘি বা পুরাণ দীঘির পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। মন্দিরের চারদিকে যে প্রাচীর ও নাটমন্দির ছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরে যে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, সেকথা শিলালিপি পাঠে জানা যায়। যদিও মন্দিরগাত্রে শিলালিপিটি বর্তমানে নেই। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, "শ্রীশ্রীগোবিন্দ মাণিক্যদেব বীর, মন্ত্রণানিপুণ ও তেজস্বী অনুজ জগন্নাথ দেবের সহিত মাতা সহরবতীর স্বর্গার্থবিষ্ণুবও মনোহর এই অতুল প্রাসাদ দান করেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য ১৫৮৩ শকের কার্তিক পূর্ণিমাতে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রাসাদ দান করে।" (শিলালিপি-সংগ্রহ, পৃঃ ২৬)। মন্দিরটি চতুষ্কোণ, চারকোণে যথারীতি চারটে ঠেসনা আছে। ঠেসনাগুলি পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির ঠেসনার মতো অলঙ্কৃত, তবে মন্দিরগাত্র অনলঙ্কৃত। এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য এই যে, মন্দিরগাত্রে কতকগুলি কুলঙ্গি আছে। কুলঙ্গিতে দেবদেবীর মূর্তি রাখা হতো নিঃসন্দেহে। সম্প্রতি নিকটস্থ পুষ্করিণী থেকে দুটি মূর্তি (বিষ্ণু ও উমামহেশ্বর) উদ্ধার করে ত্রিপুরার সরকারী মিউজিঅমে রাখা হয়েছে। চারচালার উপরে গম্বুজতুল্য অবয়ব, সেই অবয়বের উপরের অংশ বিলুপ্ত। কাশীনাথ দীক্ষিতের মতে অবশ্য "The top is crowned by a dome with a vaulted roof in pure Mohammedan fashion." (শ্রীরাজমালা, চতুর্থ লহর, ৯০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মন্তব্য), যদিও অনেকের মতে জগন্নাথ মন্দিরের মস্তক অংশ বৌদ্ধস্তূপেরই বিবর্ধিত রূপ। শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে মন্দিরটি "অবিকল সারনাথ স্তূপের মতো।" স্তূপের গায়ে পদ্ম-পাঁপড়ির অলঙ্করণ মন্দিরস্থাপত্যের ইসলামী প্রলেপকে অনেকখানি আবৃত করেছে নিঃসন্দেহে। আলসে কারুকার্য খচিত, এবং মন্দিরের দেয়ালে স্থানে স্থানে পদ্মফুল আঁকা চতুষ্কোণ ফলক আছে। মন্দিরটি পূর্বদ্বারী, যা হিন্দুমন্দিরে সচরাচর দেখা যায় না, তবে "উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দির পূর্বদ্বারী। ··· সমগ্র ভারতের মধ্যে ইহা অভিনব। পুরী, ভুবনেশ্বর, কণারক প্রভৃতি সমস্ত মন্দিরদ্বারই পূর্বদিকে।" (মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, উড়িষ্যার দেব-দেউল, পৃঃ ১৬)। উড়িষ্যার প্রভাব পড়া এক্ষেত্রে অসম্ভব নয়, বিশেষত মন্দিরটি আয়তনের প্রকাণ্ডত্ব বিবেচনা করলে তা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্ব রাধাকিশোরপুরে মহাদেব বাড়ির পূর্বদিকে কিছুদূরে পাশাপাশি তিনটি

বিষ্ণু মন্দির আছে। উত্তর দিকের মন্দিরটি গোবিন্দমাণিক্যের পত্নী রাণী গুণবতী ১৫৯০ শকাব্দে (১৬৬৮ খৃঃ) নির্মাণ করান, অন্য দুটির সন তারিখ লিখিত কোনও ফলক নেই, তবে মন্দির তিনটি সমসাময়িক কালের, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলী অন্যান্য মন্দিরের মতোই, তবে বহির্গৃহের উপর কোনও স্তূপ নেই। গর্ভগৃহে অন্যান্য মন্দিরের মতো ঠেসনা আছে, তবে স্তূপের উপর (গুণবতী মন্দিরে) আমলকের অস্তিত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়। আমলকের উপর লম্বালম্বি খাঁজকাটা উচ্চাবচ, অনেকটা, পুষ্প অলঙ্কারের মতো, ঘনসন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। মন্দিরের দেয়ালে আনুভূমিক উদ্গাত পগুর্কা রেখা ও সামনের দেয়ালে সামঞ্জস্য রেখে দরজার দুপাশে একটি আয়তাকার ও দুটি চতুষ্কোণ কুলুঙ্গি আছে। মধ্যের মন্দিরের গর্ভগৃহ অর্ধ-বৃত্তাকার।

জগন্নাথ দীঘির পূব পারের হরি মন্দিরটি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হয়েছিল। মন্দিরের চারপাশে প্রাচীর আছে এবং মন্দিরটি একটি সুউচ্চ বাঁধানো চত্বরের উপর স্থাপিত, যদিও সেখানে প্রদক্ষিণের কোনও সুবিধে নেই। দোচালা তোরণের মধ্য দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে প্রাঙ্গণ, তারপর মন্দিরের বহির্গৃহ। মন্দিরটি পশ্চিমমুখো, বহির্গৃহের সামনে দু'কোণে দুটি ঠেসনা। যথারীতি কলস অলঙ্কৃত, অন্যান্য মন্দিরের মতো দেয়ালে সমান দূরত্বে আনুভূমিক উদ্গাত পগুর্কা। বহির্গৃহের সামনে ও সর্বোচ্চ পগুর্কা রেখার মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ প্রতিষ্ঠা ফলক, বর্তমানে নেই। বহির্গৃহের পর অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহটি চতুষ্কোণ। বহির্গৃহের উত্তর দক্ষিণ দেয়ালে বহু তাক বিশিষ্ট কুলুঙ্গি এবং সর্বোচ্চ পগুর্কা রেখার মধ্যে সমতল জায়গায় সারিবদ্ধ ত্রিভুজাকৃতি অলঙ্করণ, গর্ভগৃহের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও অনুরূপ অলঙ্করণ দেখা যায়। বহির্গৃহের মস্তক অংশে স্তূপের মতো নির্মিতি। গর্ভগৃহের মস্তক অংশেও অনুরূপ স্তূপ। গোলার্ধাকার অংশের উপর বৃত্তাকার অংশ, তার উপরের অংশ অনেকটা জালার মতো, জালার মুখে নিরেট চাকতি। জালাটি লতাপুষ্প খচিত নকশার একটি বিচিত্র রূপ বলে মনে হয়।

জগন্নাথ দীঘির উত্তরপূবকোণে (গোমতী নদীর দক্ষিণ পারে, উদয়পুর) একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি সম্ভবত হরিমন্দির এবং মনে হয় গোবিন্দমাণিক্যের আমলে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য এই যে, উদয়পুরের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে কেবল এখানেই দেওয়ালে টেরাকোটা সংলগ্ন থাকার চিহ্ন আছে। দু একটি জায়গায় এখনও (দুটি আনুভূমিক পগুর্কা রেখার মধ্যের জায়গায় অথবা আলসের নীচে ফাঁকা জায়গায়) টেরাকোটা (ভগ্ন, অর্ধভগ্ন) দু-একটি দেখা যায়। গর্ভগৃহের উপরে স্তূপের পাদদেশের সারি সারি কুলুঙ্গির মধ্যে যে টেরাকোটা ছিল, তার নিদর্শন এখনও চোখে পড়ে। এমন কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও দেয়ালের মধ্যিখানে যে পুষ্পালঙ্কার গর্ভগৃহের সমস্ত দেয়াল জুড়েছিল

তা বোঝা যায়। মন্দিরটি বর্তমানে যেখানে অবস্থিত, সেখানে নদী ক্রমাগত ভাঙছে, ফলে মন্দিরটিকে রক্ষা করা যাবে কিনা সন্দেহ।

মহাদেব বাড়ির অব্যবহিত পূর্বে প্রাচীরের বাইরে পাশাপাশি দু-টি মন্দির আছে, যা এখন ভগ্ন, জীর্ণ। মন্দির দু-টি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। স্থানীয় লোকেরা একে "দুত্যার বাড়ি" বলে থাকে। পূর্বধারের মন্দিরের শিলালিপি ছিল, কিন্তু প্রায় অপাঠ্য হয়ে গিয়েছে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মন্দিরটি ১৬২১ সালে অর্থাৎ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মনে হয় দ্বিতীয়া নামে এক ভদ্রমহিলা মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন, এবং তিনি সম্ভবত বলিভীম নারায়ণের কন্যা ছিলেন।

গুণবতী গুচ্ছ মন্দিরের দক্ষিণদিকে আর একটি গুচ্ছ মন্দির দেখা যায়। মন্দির দু টির মধ্যে দক্ষিণের মন্দিরের নাম দুর্গা মন্দির, অন্যমন্দিরটি বিষ্ণু মন্দির হওয়াই সম্ভব। দু-টি মন্দিরই পশ্চিমমুখী। মন্দিরের সামনে আছে একটি দোতলা মন্দির। মন্দিরের মধ্যস্থলে আয়তাকার কক্ষ, সেই কক্ষের চারপাশে খিলানযুক্ত বারান্দা। দোতলা চার চালা বিশিষ্ট একটি কক্ষ। ঝুলন মন্দিরটি বিষ্ণু মন্দিরের ঠিক মুখোমুখি, সম্ভবত বিষ্ণুমন্দিরের জন্য মূলত মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, তাই দুর্গামন্দিরটি পরে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়। (Inspection note of Director General of Aichaeology, 1952, পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য।)

গুণবতী মন্দির পেরিয়ে উত্তর পশ্চিমে গোমতীর দক্ষিণ পারে একগুচ্ছ মন্দির দেখা যায়। এই গুচ্ছে তিনটি মন্দির আছে, এর ঠিক বিপরীত পারে (গোমতীর উত্তর পারে) মোগল মসজিদের অসমাপ্ত অট্টালিকা দেখা যায়। পাশাপাশি তিনটি মন্দিরের মুখ উত্তর দিকে। তিনটি মন্দিরের তোরণ চার-চালা, তোরণ থেকে সিঁড়ি দিয়ে বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে নাটগৃহের সংলগ্ন গর্ভগৃহ। মন্দির গুলি যথারীতি ত্রিপুরা রীতিতে নির্মিত, বর্তমান মন্দিরগুলি প্রায় ভগ্ন। মন্দির সংলগ্ন যে ভগ্ন রাজপ্রাসাদ দেখা যায়, সেটি ছত্রমাণিক্যের সময় নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। (ঐ, পৃ—৭ দ্রষ্টব্য)।

উদয়পুর শহরের মধ্যস্থলে এখন যেখানে ধর্মাশ্রম অবস্থিত, সেখানে পাশাপাশি দুটি ভগ্ন মন্দির দেখা যায়। মন্দিরটি সম্ভবত বিষ্ণু মন্দির হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ দেখা যাচ্ছে গোমতীর যে পারে উদয়পুর অবস্থিত, সেই পারে যে সব গুচ্ছ মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার বেশির ভাগ হরি মন্দির। এই গুচ্ছ মন্দির-কেই বোধ হয় "নাগের দোল" বলা হয়।

গোমতী নদীর উত্তর পারে গোবিন্দমাণিক্যের রাজপ্রাসাদ এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত, কিন্তু পুরাণ রাজবাড়ি এলাকায় দু-টি মন্দির এখনও বিদ্যমান, এবং উল্লেখযোগ্যও বটে। রাজবাড়ির পশ্চিম দিকের মন্দির অবশ্য লোক-প্রসিদ্ধ, সারা ত্রিপুরার লোকের কাছে মন্দিরটি "ভুবনেশ্বরী মন্দির" নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্য ও ছত্রমাণিক্যর কাহিনী অবলম্বন করে

'রাজর্ষি' এবং 'বিসর্জন' রচনা করেছেন। উক্ত উপন্যাস ও নাটকে ভুবনেশ্বরী মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে মন্দিরটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে। এখন যে মন্দিরসৌধ বিরাজমান, সেই সৌধে প্রবেশের জন্য কোনও তোরণ নেই, তবে প্রাচীর ও তোরণ ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। মন্দিরটি বাঁধানো চত্বরের উপর স্থাপিত। প্রদক্ষিণের সুবিধে আছে। তবে চত্বরে কোনও প্রাচীর নেই। বহির্গৃহ ও গর্ভগৃহের উপর স্তূপাকৃতি-চূড়া, কিন্তু অগ্রের উপর অন্যান্য উপাঙ্গ বোধহয় মন্দির সংরক্ষণের জন্য অপসারণ করা হয়েছে। বহির্গৃহের অগ্রে কোনও কুলঙ্গি নেই, যদিও গর্ভগৃহের উপর অগ্রে কুলঙ্গি আছে অনেকটা পদ্মের পাপড়ির আকারে।

রাজবাড়ির দক্ষিণদিকে অন্য মন্দিরটি সাধারণভাবে ভালো অবস্থায় আছে, যদিও মন্দিরের মস্তক অংশে ও অন্যান্য স্থানে আগাছা জন্মেছে। মন্দিরটি পুরোপুরি ত্রিপুরা রীতিতে নির্মিত। মন্দিরগাত্রের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৫৯৯ সনে (১৬৭৭ খৃঃ) গোবিন্দমাণিক্যর পুত্র রামমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

ত্রিপুরার অন্যতম উল্লেখযোগ্য মন্দির হচ্ছে কসবার কালী বাড়ি। "মহারাজ কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ মন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ ক্ষোদিত লিপিতে আমরা "সং ১০৯৭" প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরবর্তী ৩০ বৎসরে মন্দিরের নির্মাণ কার্য সমাধা হইয়াছিল।" (শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজমালা, ২ ভাগ ৭ অধ্যায়, পৃঃ ৮২)। মন্দিরটি ভুলক্রমে কালী-বাড়ি হিসাবে বিখ্যাত, আসলে মন্দিরে যে দেবী প্রতিষ্ঠিত, তিনি দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী। প্রতিমার নীচে শিবলিঙ্গ ক্ষোদিত থাকায় মহিষাসুরমর্দিনী কালী হিসাবে বিখ্যাত হয়েছেন। প্রবাদ আছে যে "শ্রীহট্ট জেলার উপরিভাগ হবিগঞ্জের অন্তর্গত 'কাসিম নগর' পরগণার মধ্যবর্তী 'দনসর' নামক গ্রাম-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে পূর্বে দেবী মূর্তিটি ছিল। ত্রিপুরেশ কল্যাণমাণিক্য উক্ত শাক্ত দেবী কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া তথা হইতে আনয়ন পূর্বক প্রাগুক্ত 'কৈলাসগড়' নামে প্রসিদ্ধ দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।" (শিলালিপি-সংগ্রহ, পৃঃ ৪১)। মন্দিরটি ত্রিপুরারীতিতে নির্মিত হয়েছে।

৬

অর্বাচীন মন্দিরের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক কারণে, দ্বিতীয়টি ভূমি নকশা ও গড়নের জন্য উল্লেখযোগ্য। মন্দির দু-টির নাম যথাক্রমে চতুর্দশ দেবতার মন্দির ও জগন্নাথ মন্দির। চতুর্দশ মন্দির পুরাণ আগরতলায় অবস্থিত। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য উদয়পুর থেকে রাজ্যপাট উঠিয়ে পুরাণ আগরতলায়

নতুন রাজধানী স্থাপন করেন, সেই সময় তিনি উদয়পুর থেকে চতুর্দশ দেবতা সঙ্গে এনেছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টদশ শতাব্দীতে রাজধানী উদয়পুরের উপকণ্ঠে রাষ্ট্রবিপ্লব শুরু হওয়াতে, বিশেষত সমসের গাজির আক্রমণে ভীত হয়ে তিনি উদয়পুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। "গাজীনামা" পুস্তকে সমসের গাজীর যুদ্ধ বর্ণনা দেওয়া আছে—

১. "সমসরগাজী আগে মিলি সর্বজন।
রাজসৈন্য কদাচিৎ না জিনিব রণ ॥" (পৃঃ ৩৯)

২. "মাল খাজনা জমা যত আছিল কাছারী।
আবদুল্লা লুঠি নিল আগুসারী ॥
জগতপুর খণ্ডল অবধি মণিপুর।
বৌদ্ধগ্রাম বগাসাইর মেহেরকুলপুর ॥
কুবনগর লৌহগড উদয়পুর গিয়া।
আটজঙ্গল বিশালগড সকল লুটিয়া।" (পৃঃ ৮৩)

সেজন্য কৃষ্ণচন্দ্রমাণিক্য

"আগরতলায় কৈল স্থান স্ত্রীপুত্রের।
উদয়পুর যে অবধি ছাডিলেক ॥" (পৃঃ ৯২)

(উদ্ধৃতিগুলি উদয়পুর বিবরণ থেকে সংগৃহীত)

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭০ ত্রিপুরাব্দের ১লা পৌষ (১৭৬০ খৃঃ) সিংহাসন আরোহণ করেন। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে নতুন রাজধানী নির্মিত হওয়ার পর মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরে কোনও প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় এবং মন্দিরটি পুনঃপুনঃ সংস্কার করার ফলে মন্দির নির্মাণের কাল সঠিক ভাবে বলা যায় না। চতুর্দশ দেবতা রাজাদের কুলদেবতা। কথিত আছে যে ত্রিপুরের মৃত্যুর পর রাজ্যে যখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন প্রজাগণ মহাদেবের পূজা করলে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর প্রদান করেন। সেই বরের ফলে ত্রিপুরের ত্রিলোচন নামে এক পুত্র হয়, এবং তিনি ত্রিপুরার সিংহাসন আরোহণ করেন, সেইসময় মহাদেব আদেশ করেছিলেন—

"চতুর্দশ দেব পূজা করিব সকলে।
আষাঢ মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে ॥"

(শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর, ত্রিপুর খণ্ড, পৃঃ ১৫)। ইহা দৈবাদেশের ফলে ত্রিলোচনের শাসনকালে চতুর্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চতুর্দশ দেবতার কোনও পূর্ণ অবয়ব মূর্তি নেই, চোদ্দ দেবতার চোদ্দটি মুণ্ড মাত্র পূজিত হয়। "প্রবাদ অনুসারে মহারাজ দক্ষিণ ত্রিবেগ হইতে পলায়ন কালে চতুর্দশ দেবতার মুণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণের সন্তানগণ

সেই চতুর্দশ দেবমুণ্ডের পূজা করিয়া আসিতেছেন।" (কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রাজমালা, ২য় ভাগ ২য় অধ্যায়, পৃঃ ১৯)। অথচ ভগ্ন বিগ্রহের পূজা হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত নয়, এসম্পর্কে "শিল্পরত্ন" "প্রতিমামানলক্ষণম্" (শ্লোক ১৩১-১৪০) ও অগ্নিপুরাণ ৬৭ অধ্যায় (শ্লোক ১—৪)-এ আলোচনা আছে। ত্রিপুরার পাহাড়ে এখনও সকল উপজাতি চতুর্দশ দেবতার পূজা করে থাকে, তবে তাদের দেবতার কোনও মূর্তি নেই। দেবতা সবল বাঁশ দিয়েই তৈরি হয়। বর্তমানে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে চোদ্দ দেবতার যেভাবে পূজা হয়, তা যে আর্যীকরণের ফল, তা বলা বাহুল্য। আসলে চতুর্দশ দেবতা কৌম দেবতা, বর্তমানে অবশ্য বাঙালী, আদিবাসী সকলের নিকট সমান জাগ্রত দেবতা।

মন্দিরের বহির্গৃহ আয়তাকার, এই বহির্গৃহকে মণ্ডপ বলা চলে, যেহেতু এর তিন দিকই খোলা। সামনে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, তার মধ্যেরটি ধনুকাকৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহ অভ্যন্তরে চতুষ্কোণ, কিন্তু বাইরের দিক থেকে আয়তাকার, এর কারণ গর্ভগৃহের দুপাশে ছোট ছোট দুটি কক্ষ আছে। কক্ষ দুটিরও সামনে দিকে খিলানযুক্ত দরজা আছে, এবং উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়ালে অনুরূপ প্রবেশ পথ। মন্দিরের ছাদ সমতল। ছাদের উপর অর্ধ গোলার্ধাকার অণ্ডের নীচের সামান্য অংশের উপর পর পর দুটি ঘণ্টাকার অণ্ড স্থাপিত, নীচেরটি থেকে উপরটি ছোট এবং নীচের মোচাকার অণ্ড এবং ... গোল চাকতির উপর স্থাপিত। সর্বোচ্চ ধাপের মাথায় কলস এবং কলসের উপর পতাকা দণ্ড। মন্দিরটি সুউচ্চ নয়, মন্দির গাত্র নিরাভরণ।

ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানী আগরতলায় অবস্থিত জগন্নাথ মন্দির ১৩১৬ ত্রিপুরাব্দে (১৯০৬ খৃঃ) নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের গর্ভগৃহ অষ্টকোণ বিশিষ্ট, এবং মন্দিরটি অষ্টকোণ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। গর্ভগৃহের চারপাশে প্রদক্ষিণ পথ আছে। আটকোণের কোণায় যে স্তম্ভ আছে, সেগুলির মাথার উপর বহু স্তবকযুক্ত কুলঙ্গি আছে, সেই কুলঙ্গির উপর ত্রিভুজাকৃতি শঙ্কু (cone)। গর্ভগৃহের মাথায় চত্বরে প্রায় পাঁচ-ছ ফুট অষ্টকোণী চূড়া, চূড়ার উপর জালের মতো বোনা বিচিত্র অলঙ্করণ। এই জাল সদৃশ নকশার উপর চূড়া চারটি খাড়া থাকে বা স্তরে স্তরে উপরে উঠে গেছে। সর্বোচ্চ থাক-টি নিরাভরণ, যার উপর আমলক স্থাপিত। আমলকটি নিরলঙ্কার শঙ্কু ও ওল্টানো পদ্মের মধ্যে যেন পিষ্ট। পদ্মের উপর যথাবিহিত পতাকা দণ্ড। নীচের তিনটি থাক পদ্মযুক্ত কুলঙ্গি দিয়ে সাজানো, এবং কুলঙ্গির খিলান পর্ণপুষ্প খচিত নকশায় ভরা। মন্দিরের শিখর এখানে গর্ভগৃহের চত্বর উত্থিত জালি নকশার উপর স্থাপিত চারটি থাক সমেত অষ্টাকোণী পিরামিডাকার নির্মিতি, যার উপর আমলক পদ্ম পতাকাদণ্ড স্থাপিত।

জগন্নাথ মন্দিরের আকৃতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে মন্দিরটিকে ভদ্র বা পীড দেউলের পর্যায়ে ফেলা যায় না, যদিও জগন্নাথ মন্দিরের শিখর থাকে থাকে

পিডামিডাকৃতি হয়ে উপরে উঠে গেছে। ভদ্রদেউলের শিখর সোপানস্তরিত ক্রমহ্রস্বায়মান হয়ে উপরে উঠে যায়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শিখর উল্লম্বভাবে পিরামিডাকার। পুরাতন আগরতলায় মন্দিরটি বরং ত্রিপুরারীতিতে নির্মিত বলা যায়। অর্ধগোলাকার অণ্ডটিকে বেদী ধরে নিলে উপরের ঘণ্টাকার আকৃতিকে অণ্ড এবং তৎ উর্ধ্বে নির্মিতিকে হর্মিকা বলা যায়, যদিও এখানে হর্মিকা চতুষ্কোণ নয়, ঘণ্টাকার অণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রলম্বিত করা হয়েছে। অন্যদিকে মন্দিরের ছাদ সমতল হওয়ার এই মন্দিরটিকে সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরা রীতির নিদর্শন বলা চলে না।

ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। পূর্বে এ রাজ্যের সীমা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে, তবু তার সীমা সমস্ত দিকেই যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল না। বর্তমান ত্রিপুরার সন্নিহিত অঞ্চলে, বিশেষ করে ত্রিপুরা জেলায় মহারাজদের প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত অটুট ছিল, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে যেমন উত্তর শ্রীহট্ট বা কাছাড় অঞ্চলে সে প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি, ফলে ত্রিপুরারাজ্য কোনদিন বিরাট রাজ্যে পরিণত হয় নি। এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের মন্দিরস্থাপত্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী শৈলীর আশ্চর্য মিলন ঘটেছে। এই নতুন রীতি (যাকে ত্রিপুরা রীতি বা ত্রিবেগ রীতি বলা হয়েছে) ত্রিপুরায় ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, তার প্রমাণ অবশিষ্ট মন্দিরগুলিতেও লক্ষণীয়। মন্দিরের মস্তক অংশে বৌদ্ধ স্তূপের নিদর্শন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত রাজধানী আগরতলায় লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরেও লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরের শীর্ষ অংশ (গর্ভগৃহের ছাদের উপর মোচাকার অণ্ড বৃত্তাকার বেদীর উপর স্থাপিত, হর্মিকাটি এখানে বহুকোণ বিশিষ্ট, হর্মিকার উপর আবুধ। এমনকি স্তূপের চারপাশে প্রদক্ষিণ পথের রেলিং যুক্ত প্রাচীরও দেখা যায়) দেখলে অন্যান্য মন্দিরের শীর্ষ অংশ সম্বন্ধে যেটুকু সংশয় জাগে, তা সহজে দূর হয়। ত্রিপুরায় মন্দিরের শীর্ষ অংশ যে বৌদ্ধ স্তূপেরই বিবর্ধিত রূপ, তা অসংকোচে বলা চলে। এ অঞ্চলে মন্দির নির্মাণে স্থানীয় আদিবাসীরা নিযুক্ত হতেন না, বোধ হয় শ্রীহট্ট অঞ্চল থেকে কারিগর আনা হত। কারণ মন্দির নির্মাণে দক্ষ কারিগরদের বাস ছিল সন্নিহিত শ্রীহট্ট অঞ্চলে। তাই মন্দির নির্মাণে স্থানীয় আদিবাসীদের গৃহনির্মাণ প্রভাব পড়েছে কিনা সঠিকভাবে বলা মুস্কিল। যোগ্য ব্যক্তি এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালালে একটি অন্ধকার দিক উন্মোচিত হবে সন্দেহ নেই, তখন নতুন তথ্যের আলোকে ত্রিপুরার মন্দির সম্পর্কে নতুন ভাবনার অবকাশ ঘটবে নিশ্চয়।

পরিশিষ্ট

সম্পূর্ণ ভগ্ন, অর্ধভগ্ন, অভগ্ন এবং বিলুপ্ত প্রাচীন মন্দিরের তালিকা :

১. ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির, উদয়পুর থেকে ৪ কিলোমিটার (প্রায়) দূরে অবস্থিত।

২ উনকোটী তীর্থে মন্দির—"তাহার লুপ্তপ্রায় চিহ্ন এবং ইষ্টক ও প্রস্তরাদি সরঞ্জাম এখনও পর্বতের শৃঙ্গদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দির কাহার নির্মিত ছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।" (শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয় লহর, পৃঃ ১১২)। তবে এই স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত মন্দির ছিল, তা অনুমান মাত্র। (শ্রী শ্রীযুক্তের কৈলাসহর পরিভ্রমণ পুস্তিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১১২) ৩

৩. মহারাজ ধন্যমাণিক্য নির্মিত বলে কথিত—

ক. বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর (এই মন্দিরটি বোধহয় ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) ২

খ. পুরাতন দীঘির তীরবর্তী মন্দির, উদয়পুর ৩

গ লোক পালানো (শ্মশান) মন্দির, উদয়পুর ৩

ঘ হরমন্দির, জগন্নাথ দীঘির পূর্বপাড়ে অবস্থিত, উদয়পুর

ঙ শিবমন্দির, উদয়পুর ৩

৪ চৈতন্যনারায়ণের জগন্নাথ মন্দির, উদয়পুর ৩

৫ মহারাজ রাজধর মাণিক্যের বিষ্ণুমন্দির উদয়পুর ৩

৬ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য নির্মিত বলে কথিত—

ক. বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর (বোধহয় বদরমোকাম থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত) ২

খ দুর্গামন্দির, উদয়পুর ২

গ দোলমঞ্চ, উদয়পুর

ঘ দ্বিতীয় বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর

৭ কালীমন্দির, কল্যাণপুর ৩

৮ জয়কালীর মন্দির, কসবা

৯ মহাদেবের বাড়ি, উদয়পুর, একই আবেষ্টনীর মধ্যে তিনটি মন্দির—

ক চতুর্দশ দেবতার মন্দির (শ্রীরাজমালার প্রথম লহরে একটি ভগ্ন চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের [উদয়পুর] চিত্র আছে, বর্তমানে সেই মন্দিরটি কোথায় ছিল, তা বলা মুস্কিল। চতুর্দশ দেবতার মন্দির রূপে যা এখন খ্যাত তা আদৌ চতুর্দশ দেবতার মন্দির নয় বলে অনেকে অনুমান করেন।)

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

গ. শিব মন্দির

১০. জগন্নাথ বাড়ি, উদয়পুর, ১

১১. বর্তমান ধর্মাশ্রমে অবস্থিত দু-টি মন্দির, উদয়পুর ২

১২ দুত্যার বাড়ি, উদয়পুর ২

১৩ গুণবতী গুচ্ছ মন্দির, উদয়পুর

১৪. গোমতীর দক্ষিণপারে ছত্রমাণিক্য প্রাসাদের পাশে পাশাপাশি তিনটি বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর ২

১৫. জগন্নাথ দীঘির উত্তরপূর্ব কোণের বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর ১

১৬ গোবিন্দমাণিক্যের রাজবাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর (গোমতীর উত্তর পার) ২

১৭ ভুবনেশ্বরী মন্দির, উদয়পুর (গোমতীর উত্তর পার) ২

১৯ গোপীনাথের মন্দির, হীরাপুর ২

বর্তমান সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির—

১ চতুর্দশ দেবতার মন্দির, পুরাতন আগরতলা

২ জগন্নাথ মন্দির, আগরতলা

৩ লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি, আগরতলা

৪ শিববাড়ি, আগরতলা

সংকেত সূত্র

৩ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত

২ ভগ্ন বা বিলুপ্তির মুখে

১ অর্ধভগ্ন এবং ক্রমাগত ক্ষয়ের মুখে

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১৪	চণ্ডাই	চম্বাই
১৪	৫	৭৩৩	১৭৩৩
২০	৩	ঐতিহাসিকের	ঐতিহাসিকেরা
২২	১১	নীলাচল	নীলাচল
২৮	২৫	হরিগঞ্জ	হবিগঞ্জ